অভীক দত্ত

খেলাঘর ও অন্যান্য গল্প



খেলাঘর এবং অন্যান্য গল্প

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

https://iwrite.app

উৎসর্গ – পাহাড়ের সন্ধ্যাগুলোকে

ভূমিকা- এ বই আমার গত দেড় বছরে লেখা গল্পগুলোর সংগ্রহ। কোন গল্প শুরু করেছিলাম একরকম ভেবে, শেষ হতে দেখা গেল যেমন ভেবে শুরু করেছিলাম, একেবারেই সেরকম হল না। গল্পগুলো লিখে ভাল লেগেছে তাই বই করার সিদ্ধান্ত নিলাম। পাঠক বাকি বইগুলোর মতই এই বইটিকেও আপন করে নেবেন, এ আশা রাখি।

অভীক

সূচিপত্র

খেলাঘর

১

একটা বেলুন পাওয়া গেছে। তুয়া সেটা নিয়ে গাড়িতে উঠেছে।

অভিষেক সেটা দেখে ভ্রু কুচকাল কিছু বলল না।

ঊর্মি বিরক্ত গলায় বলল "বেলুন নিয়ে গাড়িতে উঠলি কেন আবার?"

তুয়া উত্তর দিল না। এ প্রশ্নের উত্তর হয় না।

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল।

ঊর্মি মনে মনে বলল "দুর্গা দুর্গা"।

গাড়ির পিছনের সিটে তুয়া আর ঊর্মি বসেছে।

ঊর্মি বলল "মেয়েটাকে ফোন করেছো?"

অভিষেক বলল "হ্যাঁ। এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবে"।

ঊর্মি বলল "ওকে"।

তুয়া বেলুনটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মার কথাটা তার কানে গেছে। সে বলল "কোন মেয়ে মা?"

ঊর্মি বলল "তোমার এক পিসি"।

২

প্লেন বাগডোগরায় নেমেছে। গাড়ি জোগাড় হয়ে গেছে।

জানা গেছে মেয়েটার নাম বিথী। তুয়া বিথীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছে। বিথী উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

গাড়ি পাহাড়ের রাস্তা ধরল দুপুর এগারোটায়।

সাড়ে তিনটে নাগাদ তারা কালিম্পং পৌঁছল।

দুটো ঘর নেওয়া হয়েছে। একটা ঘরের থেকে আরেকটা একটু দূরে।

ঘরে ঢুকে তুয়া প্রথম প্রশ্ন করল, "মা, বাবা বিথী পিসির সঙ্গে কেন থাকবে?"

৩

অভিষেক জানলার ধারে একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছে। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

বিথী ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে বলল "এখন কোন প্ল্যান আছে?"

অভিষেক বিথীর দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বলল "তোমার আসল নাম কী?"

বিথী চমকাল না। খাটের ওপর বসে স্বাভাবিক গলায় বলল "সেটা বলা যাবে না"।

অভিষেক হাসল "ঠিক আছে। বোল না। বি আনড্রেসড"।

বিথী উঠে দাঁড়িয়ে পরনের সব পোশাক খুলে ফেলল। অভিষেক বিথীর দিকে তাকিয়ে বলল "দাঁড়িয়ে থাক"।

বিথী নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল।

অভিষেক উঠে দাঁড়িয়ে বিথীর গালে চুমু খেল। শরীর স্পর্শ করে বলল “তুমি অভিজ্ঞ। আমাকে জাগাও তো দেখি”।

বিথী অভ্যস্ত ভঙ্গিতে অভিষেকের ঠোঁটে আঙুল রাখল। অভিষেক বিথীর ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে যাচ্ছিল এমন সময় তার কটেজের কলিং বেল বেজে উঠল। বাইরে থেকে তুয়ার গলার স্বর ভেসে এল “বাবা, তাড়াতাড়ি এসো। আমরা হাঁটতে বেরব”।

৪

বিথী ঘরে থেকে গেল। তুয়া, অভিষেক আর ঊর্মি হাঁটতে বেরিয়েছে।

তুয়া অভিষেককে বলল "বাবা, ওই আন্টি আর তুমি একসাথে থাকছ কেন?"

অভিষেক ঊর্মির দিকে তাকাল। ঊর্মি অভিষেকের দিকে থমথমে মুখে তাকিয়ে বলল "এর উত্তরটা তুমিই দাও"।

অভিষেক তুয়াকে কোলে তুলে বলল, " মা, আন্টির সাথে আমার অফিসের কাজ আছে"!

পরক্ষণেই কথা ঘোরাল, "চল, আমরা খেলনা কিনি তোমার জন্য"।

তুয়া ভুলল না, বলল "তুমি রাতেও কাজ করবে"?

অভিষেক বলল "হ্যাঁ, অনেক কাজ আছে"।

ঊর্মি বলল " মেয়েকেও সত্যিটাই বলে দাও। লুকনোর তো কিছু নেই।"

অভিষেক উত্তর না দিয়ে হাঁটতে থাকল।

বাজারে এল তারা কিছুক্ষণ পরে। ঊর্মি বলল "তুমি প্রোটেকশন ইউজ করছ?"

অভিষেক বলল "আমি এখনও কিছু করি নি"।

ঊর্মি বলল " বিশ্বাস করি না"!

অভিষেক বলল "কোর না, কেউ মাথার দিব্যি দেয় নি"।

ঊর্মি আর কিছু বলল না।

৫

বেল বাজালে বিথী দরজা খুলল। ঊর্মি আর তুয়াকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসেছে অভিষেক।

বিথী একটা শর্টস পরে আছে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা।

অভিষেক ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল " ঘুমোলে?"

বিথী মাথা নাড়ল। বলল "আপনি কিছু করবেন?"

অভিষেক বিরক্ত হয়ে বলল "করা ছাড়া আর কিছু ভাবো না?"

বিথী যন্ত্রের মত বলল "সেটাই তো আমার কাজ। ভাবার সময় নেই"।

অভিষেক এগিয়ে গিয়ে বিথীকে চুমু খেল। সেকেন্ড তিনেক পরে তেতো গলায় বলল "মুখে পেঁয়াজের গন্ধ আসছে"।

বিথী বলল " ব্রাশ করেছিলাম। গন্ধটা যায় নি। চুমুটা এখন বাদ দিন"।

অভিষেক বলল "ঠোঁট না ছুঁলে প্রেম হয় না', আমার এই কবিতাটা পড়েছ?"

বিথী বলল "আপনি কবি?"

অভিষেক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

৬

হোম স্টের ডাইনিং রুম। ঊর্মি, অভিষেক একসঙ্গে বসেছিল। তুয়া বিথী তাদের উল্টোদিকে।
তুয়া বিথীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে যাচ্ছে। "আন্টি তুমি কোথায় থাকো",
"আন্টি তোমার বাড়িতে কে কে আছে?"
ঊর্মি তীক্ষ্ণ চোখে বিথীর দিকে তাকিয়ে রইল।
খাওয়া হয়ে গেলে তুয়া আর বিথী হাঁটতে বেরোল।
ঊর্মি হোমস্টের বাইরের বসার জায়গায় বসে অভিষেককে বলল "তারপর? কিছু লিখতে পারছ?"
অভিষেক সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বলল "নাহ"!
ঊর্মি বলল "তাহলে লাভ কী হল?"
অভিষেক বলল "প্ল্যানটা তোমার। তুমিই বুঝবে"।
ঊর্মি বলল " শরীর সাড়া দেয় না তোমার আমার সঙ্গে থাকলে। এছাড়া আর কী প্ল্যান দেব তোমায়?"
অভিষেক বলল "কবিতা শরীরে সাড়া দেয় না। ভালবাসায় সাড়া দেয়"।
ঊর্মি অভিষেকের দিকে তাকিয়ে বলল "কেমন ভালবাসা চাও তুমি?"
অভিষেক কথা না বলে স্মোক করতে লাগল।
ঠান্ডা পড়ছিল।
বীথিকে তুয়াকে নিয়ে ফিরে এল।
ঊর্মি বীথিকে বলল "তোমার ঠান্ডা লাগছে না?"
বীথি উত্তর না দিয়ে অভিষেকের দিকে তাকিয়ে বলল "আমি ঘরে গেলাম"।
তুয়া বলল "আমিও আন্টির সাথে যাব"।
ঊর্মি তুয়াকে চড় মারল।তুয়া কাঁদতে শুরু করল।
অভিষেক তুয়াকে কোলে নিয়ে ঊর্মিকে বলল "মারছ কেন?"
ঊর্মি বলল "অত দরদ দেখাতে হবে না পরের মেয়েকে। দাও আমার কোলে দাও"।
তুয়া অভিষেককে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল।
অভিষেক বলল " থাক। আমি ওকে ঘুম পাড়িয়ে তারপর যাব"।
ঊর্মি নিজেদের কটেজের দিকে রওনা দিল।

৭

তুয়া ঘুমিয়েছে। ঊর্মি বলল "যাও, তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে"।
অভিষেক বলল "যাব। তোমার ভয় লাগবে না তো?"
ঊর্মি বলল "কেন, ভয় লাগলে তুমি থাকবে বুঝি?"
অভিষেক বলল "তুমি চাইলে থাকব"।
ঊর্মি বলল " নাহ। যাও। মেয়েটা একা আছে"।
অভিষেক বলল "তোমার কি কিছুই হয় না? অ্যাটলিস্ট আমাদের কল্পনা করেও?"
ঊর্মি বলল "হয় না। আমার কিচ্ছু হয় না। আমার তোমাকে দেখে কিছু জাগে না। দেখো এই অনিচ্ছা দেখে তোমার কোন লাইন মাথায় আসে নাকি"।
অভিষেক বলল " জাগা শুনলে আমার হাগা ছাড়া আর কোন লাইন মাথায় আসছে না আপাতত"!
ঊর্মি হেসে বলল "দেখো, বীথিতে ঘুরে টয়লেট হিউমার থেকে উত্তরণ করতে পারো নাকি"।
অভিষেক বলল " দেখি"।

#

বীথি দরজা খুললে অভিষেক বীথির ঠোঁটে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বীথি বাঁধা দিল না। অভিষেক সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে বীথিকে খাটে শোয়াল। নগ্ন করল। গোটা শরীরে চুমু খেতে লাগল।

বীথি শীৎকার করে অভিষেকের চুল আঁকড়ে ধরল। অভিষেক হঠাৎ সব কিছু থামিয়ে বলল "তুমি অভিনয় করছ, তাই না? ফেক অরগাজম?"

৮

রাত তিনটে। বীথি তার পাশে ঘুমিয়ে আছে।

অভিষেকের ঘুম আসছিল না। সে আলো জ্বালল। বীথি কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছে। অভিষেক কম্বল সরালো। সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়েটা শুয়ে আছে।

কবিরা সোনাগাছি যায় তো। এক কবি লিখেছিলেন সোনাগাছিতে গিয়ে কোন নগ্ন বারবনিতার কোলে মাথা রেখে শুয়ে তাকে মা ডেকেছিলেন।

অভিষেকের হাসি পেল এত রাতেও।

কবি মানেই কি ন্যাকা হতে হবে?

৯

অমিতের ঘুম পাচ্ছে। খিদেও পাচ্ছে।

আগে খাবে না ঘুমিয়ে নেবে বুঝতে পারছে না।

টিভিটা অকারণে চলছে। বন্ধ করতে ইচ্ছা করছে কিন্তু পারছে না।

অমিত কবিতা লিখতে বসেছিল। “দ্রোহপত্র” লিটল ম্যাগের জন্য।

সম্পাদক বলেছেন নরম কবিতা দিতে।

অমিত লিখেছিল

“স্তনের মত ছড়িয়ে পড়ুক তোমার পরিচয়,

বাসলে ভাল সবাই কেন মায়ের মত হয়”?

সম্পাদক স্তন বাদ দিতে বলেছেন কবিতা থেকে। স্তনে অনেকের অনুভূতিতে লাগে। স্তন, নাভি এগুলো নাকি পর্ণোগ্রাফি হয়ে যাচ্ছে। আজকাল কবিতা লিখতে হলে অনেক কিছু বাদ দিয়ে লিখতে হয়। মানুষের অনুভূতি আর স্তনবৃন্ত এক হয়ে গেছে। নাড়া দিলেই জেগে ওঠে।

ফোন বাজছে। অমিত ঘড়ি দেখল। অবাক হল। প্রায় ভোর রাত হতে চলেছে। কে ফোন করবে?

সে ফোন দেখে হাই তুলল। অভিষেক। নির্ঘাত লিখতে পারছে না।

অমিত ফোন কেটে দিল। অভিষেক মেসেজ করেছে “মেয়েটা ল্যাংটো হয়ে ঘুমাচ্ছে। এখন তোলা ঠিক হবে?”

অমিত উত্তর দিল না। অভিষেকের মধ্যে আবার পাগলামি ফিরে আসছে। সে আর এই পাগলামির প্রশ্রয় দিতে চায় না।

এর আগে ঊর্মিকে নিয়ে পালাবার সময়েও সে সাহায্য করেছিল।

ঊর্মির বর নীলাদ্রি নিরীহ লোক। তার কাছে কেঁদে ফেলেছিল।

অমিত অভিষেকের থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে।

অভিষেক দেয় না।

তাকে জড়াবেই। এবারেও কালিম্পং নিয়ে যেত তাকে। শেষ মুহূর্তে পালিয়েছে।

অমিত ফোন অফ করে দিল।
অভিষেককে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।
কিছুতেই না।

১০

সকাল ন'টা।
চারজন ডাইনিং রুমে এসেছে। ভোর রাতের দিকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে কালিম্পঙে। তার সঙ্গে হাওয়া। ঠান্ডায় কাঁপছে তুয়া। অভিষেক তুয়াকে কোলে নিয়ে বসেছে।
ঊর্মি বীথীকে জিজ্ঞেস করল "ঘুম হয়েছে?"
বীথী মাথা নাড়ল।
ঊর্মি অভিষেকের দিকে তাকাল "তোমার কবিতা বেরোল?"
অভিষেক ঊর্মির কথার উত্তর না দিয়ে তুয়াকে বলল "আজ তো পাহাড় দেখা যাবে না বাবু। কী হবে আজকে?"
তুয়া কাঁদো কাঁদো গলায় বলল "পচা জায়গা। আমি বাড়ি যাব"।
অভিষেক তুয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল "যাবে তো বাবু। বাড়ি গেলেই তো ছুটি খতম। যত বেশি দিন থাকা যায়, তত ভাল, তাই না? তোমার আবার আন্টি পড়াতে চলে আসবেন, সেটা ভাল হবে?"
তুয়া মুখ গোমড়া করল।
ব্রেড, বাটার, অমলেট, স্যুপ, দুধ, কর্ণফ্লেক্স, জ্যুস।
তুয়াকে পাশের সিটে বসাল অভিষেক।
ঊর্মি বীথীকে বলল "তোমার ঠান্ডা লাগে না? এই ঠান্ডাতেও ক্লিভেজ বের করে আছো?"
বীথী অভিষেকের দিকে তাকাল। অভিষেক হাসল "সবাই তো তোমার মত ঠান্ডা মেরে যায় না ঊর্মি"।
ঊর্মি বলল "এখন নিশ্চয়ই আবার ঘরে ঢুকে যাওয়ার প্ল্যান করছ?"
অভিষেক বলল "হ্যাঁ। এছাড়া আর কী করব? এই ওয়েদারে তো কোথায় যাওয়া যাবে না"।
তুয়া বলল 'আমরা খেলব না বাবা?"
অভিষেক বলল "তোমায় মা এখন পড়াতে বসাবে। একটু পড়ে নাও। তারপর খেলি। কেমন?"
ঊর্মি বলল "আমি পড়াব?"
অভিষেক বলল "হ্যাঁ। এনগেজ রাখতে হবে তো"।
ঊর্মি গম্ভীর মুখে খেতে লাগল।

১১

বৃষ্টি পড়ছে খুব জোরে।
বীথী জানলার কাছে শাল জড়িয়ে বসে আছে।
অভিষেক খাটে নোটবুক আর পেন নিয়ে বসে আঁকিবুঁকি কাটছে।
বীথী বলল "আপনি কোন কোন কাগজে লিখেছেন?"
অভিষেক বলল "বেশ কয়েকটা। আজকাল বেরোচ্ছে না লেখা। সম্পাদকরা বলছে আমার লেখা মনোটোনাস হয়ে যাচ্ছে। ছন্দ ব্যাকডেটেড"।
বীথী বলল " এই বৃষ্টিতে কিচ্ছু মাথায় আসছে না?"
অভিষেক বলল "না। ঘুরে ফিরে ছন্দে চলে যাচ্ছি"।

বীথী বলল " কী রকম শুনি?"
অভিষেক মাথা নাড়ল "ধুস। কিছু হয় নি। তুমি এদিকে এসো"।
বীথী উঠে অভিষেকের সামনে এসে বসল। অভিষেক বীথীর চুলে হাত দিয়ে বলল " স্পা কর?"
বীথী বলল "হ্যাঁ"।
অভিষেক বলল " আমিও করি। আমার চুল কেমন লাগে তোমার। হাত বুলিয়ে দাও তো"।
বীথী কোন প্রশ্ন না করে অভিষেকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। অভিষেক বলল "আমার ঘামের গন্ধ ভাল লাগে। এখানে ঘাম হচ্ছে না"।
বীথী হাসল।
অভিষেক বলল " একটু বরফ আনাই? নিপলে ঘষব"।
বীথী বলল "আনান"।
অভিষেক বলল " তোমার ঠান্ডা লাগবে না?"
বীথী বলল "আপনার নিপলে ঘষবেন তো? আমার কথা বললেন নাকি?"
অভিষেক হেসে ফেলে বলল "তুমি রসিক। ইউ ডু হ্যাভ সেন্স অফ হিউমার। অনেকের থাকে না।"
বীথী বলল "অনেকের টাকা থাকে, আমার থাকে না"।
অভিষেক বলল " কেন? অনেক টাকা পাবে তো এই ট্যুরটায়?"
বীথী বলল "এজেন্সিই হাফ খেয়ে নেবে"।
অভিষেক বলল " শিট। আচ্ছা আমি তোমায় আলাদা করে দেব আরো।"
বীথী বলল "দেবেন। ভালই হয়।"
অভিষেক বলল "তোমার হিস্ট্রি কী? বাড়িতে কে অসুস্থ?"
বীথী বলল "কেউ না। জাস্ট গরীব। এবং বাজে পরিবার। একদিন এইডসে মরে যাব। এর বেশি কী হবে?"
অভিষেক বীথীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল "সবাই মরে যাব। কেউ এইডসে, কেউ একাকীত্বে"।
বীথী বলল " আপনি একা?"
অভিষেক বলল "আমি একজনের বউ বাচ্চা ভাগিয়েছি। তার সেক্সুয়াল ফ্রিজিডনেস আছে জেনেও তাকে আমি ভালবেসেছি। তার মেয়ে আমাকেই বাবা হিসেবে জানে। তবু আমি একা। কেন একা?"
বীথী বলল "আপনি সেক্সুয়ালি ফ্রাস্ট্রেটেড"।
অভিষেক বলল " কেন? আমার কি লিঙ্গ ছোট? ঠিকই আছে না?"
বীথী হেসে বলল "না না। সেসব না।"
অভিষেক বলল "এসো চুমু খাই। জিভে জিভ মিশুক। রেকর্ড করি চল দীর্ঘতম চুমু খাওয়ার"।

১২

জাহ্নবী লিখেছে “প্রেম পাচ্ছে। করবে?”
অমিত মেসেজটা দেখে লিখেছে “কবি মাত্রেই বদ। বদ লোকের সঙ্গে প্রেম করবে?”
জাহ্নবী লিখল “আমিও তো বদ। ভাল কোথায় বললাম”?
অমিত- “বদ সবাই হতে পারে না। তুমি তো আরও পারবে না। তুমি ভালবেসে ফেলো। আর তুমি আমার কী দেখে ভালবাসলে? পাগলামি দেখে? আসলে আমি কিন্তু খুব বোরিং একজন লোক”।
জাহ্নবী-“আমিও। লেটস মেক লাইফ মোর বোরিং”।
অমিত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ফেসবুক আসার পর এসব বেড়েছে। এত প্রেম পায় কোথায় এরা? পায়খানা পরিষ্কার হয় এদের? তার তো হয় না। ডাক্তার বলেছে ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম হয়েছে।

সে নাম দিয়েছে ইরিটেবল বাওয়াল সিন্ড্রোম। সকালে যখন কমোডে বসবে তখন মনে হয় পেছনে কেউ সিমেন্ট দিয়ে রেখে দিয়েছে। ঘর থেকে বেরনোর পরে বেজায়গায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির মত পেট ডেকে ওঠে। শহরের বিভিন্ন সুলভ শৌচাগার, শপিং মলের বাথরুমে অমিতের অবাধ যাতায়াত। টালিগঞ্জের সুলভের দারোয়ানটা তাকে চিনেও গেছে। মাঝে মাঝে টাকা নেয় না। ডেইলি প্যাসেঞ্জার ডিসকাউন্ট দেয় আর কী।

জাহ্নবী পিং করছে। অমিত লিখল "ভালবাসব না তোমার চোখ দুটো দেখে/না হয় বাসব না তোমার ঠোঁটের আদরে/ কোনদিন ভাসিও সমুদ্র প্লাবনে/ থেকো সাথে ভিজে গায়ে ওমের চাদরে"।

জাহ্নবী কবিতায় লাভ রিয়্যাকশান দিয়ে লিখল "আই লাভ ইট। ইউ আর এ ম্যাজিসিয়ান"।

অমিত- "বাজার হয় নি এখনও। কী খাব বল তো?"

- (হাসি ইমোজি দিয়ে) আমায় খেয়ে যাও।

- তুমি আগের দিন অভিষেকের কবিতাতেও দেখলাম ভাল ভাল কমেন্ট করেছ। সবার কবিতাই তোমাকে ভালোবাসায়?

- (রাগ) তোমারটা সব চেয়ে বেশি।

- দু লাইনে কবিতা হয় না। তোমরা আসলে প্রেমে পড়ার বাহানা খোঁজো জাহ্নবী।

- খুঁজি। তুমি জানো না তুমি কীভাবে আমাকে ছোঁও।

- আচ্ছা, একগাদা গদগদ কমেন্টের ভিড়ে তোমারও গদগদ কমেন্ট দিতে, লাভ ইউ লিখতে একবারও গা ঘিন ঘিন করে না তোমাদের?

- তুমি হিংসুটে।

- তা ঠিক। কিন্তু বল না, গা ঘিন ঘিন করে না। এত আদরবাসা টাইপ করতে? কী পাও?

জাহ্নবী রিপ্লাই দেওয়া বন্ধ করে দিল।

অমিত বুঝল রেগে গেছে। সে স্ট্যাটাস দিল

"শরীর বলতে শরীর বুঝো,
খামোখা ভালোবাসার নামে
নিমকি ছেনালি করতে এসো না"।

মিনিট পাঁচেকে লাইক একশো, শেয়ার চল্লিশ।

অমিত মনে মনে বলল "মাদারচোদ ফেসবুক শালা"।

১৩

"আমি বহুগামী।
বহুগামিতা রোগ নয়।
অপরাধ বলে সবাই,
ধর্মাবতার..."

এই অবধি লিখে থেমে গেল অভিষেক। কী বিচ্ছিরি পরিস্থিতি! এটা কিসসু হচ্ছে না।

বীথীর নগ্ন পিঠের ওপর নোটবুক রেখে লিখছে সে।

বীথী খোলাচুলে শুয়ে আছে।

কোমর অবধি চুল বীথীর।

অভিষেক বীথীর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল "তোমার সম্পর্কে কিছু বল শুনি"।

বীথী বলল "কিছু বলার নেই"।

অভিষেক বলল "সংসার করার ইচ্ছে হয় না?"

বীথী হেসে বলল "তারপর আমার লোকটা আরেকটা বীথীর সাথে শুয়ে বেড়াবে?"

অভিষেক বলল "পয়েন্ট টু বি নোটেড। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের এক নারীতে হয় না। আমি তাদের দলে পড়ি"।

বীথী বলল " আপনিও তবে একদিন এইডসে মারা যাবেন"।

অভিষেক বলল "হয়ত। কী আর হবে? পাপ কমবে একটা। মেয়েটার জন্য কষ্ট পাব। বড় মায়াবী মেয়েটা"।

বীথী বলল " হ্যাঁ। কী করছে এই বৃষ্টিতে?"

অভিষেক বলল "মার খাচ্ছে হয়ত। মেয়েটা বড় মার খায়।"

বীথী বলল "এইটুকু বাচ্চা?"

অভিষেক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল "মায়ের ফ্রাস্ট্রেশন, মেয়ের ওপর পড়ে। কিছুক্ষণ পর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবে। আবার মারবে। আবার কাঁদবে। সংসার ভীষণ নিষ্ঠুর। আমার ঊর্মিকে নিয়ে পালানোটা ঠিক হয় নি"।

বীথী বলল "খুব ভালবাসেন?".

অভিষেক হাসল। বীথীর পিঠে মুখ রেখে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ে চুমু খেল। বীথী বলল " আপনার সাথে শোয়ার একটাই ভাল দিক। আপনি লাভ মেকিং জানেন"।

অভিষেক বীথীর চুলে মুখ ডুবিয়ে বলল "কবিরা প্রেম করতে জানে তো"।

বাইরে বাজ পড়ল একটা খুব জোরে।

আর্তনাদ ভেসে এল।

অভিষেক ধড়মড় করে উঠে জামা পরতে পরতে বলল " মেয়েটা ভয় পায় খুব। তুমি থাকো, আমি দেখে আসি।"

১৪

সকাল সাড়ে দশটা। অমিত শুয়ে শুয়ে ফ্যানের গায়ে লেগে থাকা নোংরা দেখছিল।

ফ্যানে নোংরা জমছে। ভাল ব্যাপার না। তার উচিত পরিষ্কার করা, কিন্তু পোষাচ্ছে না। অনেক পরিশ্রম। সব থেকে বড় ব্যাপার তার ডাস্ট অ্যালার্জি আছি। পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখা গেল নাকে ধুলো ঢুকে হাঁচি শুরু হল। একের পর এক হাঁচি হতে থাকে তার।

কলিং বেল বেজে উঠল। অমিত বিরক্ত হল।

এখন আবার কে এল? খাট থেকে উঠতে হবে।

সে উঠল না। কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে দেখল আবার বাজছে।

বিরক্ত মুখে দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখল নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে আছে।

সে বলল "তুমি? এখন?"

নীলাদ্রি বলল "শুনলাম অভিষেক ওদের নিয়ে বেড়াতে গেছে। তুমি জানো?"

অমিত সতর্ক হল। ঊর্মি চলে যাওয়ার পর থেকে নীলাদ্রি সামান্য সাইকোটাইপ হয়ে গেছে। বলল "না তো। আমি জানি না কিছু। কে বলল তোমায়?"

নীলাদ্রি তার তোয়াক্কা না করে ঘরের ভিতর ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসে বলল "সব জানি। খবর এসে গেছে"।

অমিত বলল "তুমি এখন অফিস যাও না?"

নীলাদ্রি বলল "কার জন্য রোজগার করব? বউ আর মেয়েই তো নেই। পরিবারই নেই। কার জন্য রোজগার করব বল? চাকরি করেই বা কী হবে?"

অমিত কী বলবে বুঝতে পারবে না। তার সামনে একটা পুরোপুরি হেরে যাওয়া মানুষ বসে আছে যার বউ পালিয়েছে অন্য পুরুষের সঙ্গে।

নীলাদ্রি একটা জংলা জামা পরে আছে। জামার একটা বোতাম নেই আবার। এই ছেলেটাকে দেখে কে বলবে আগে একে দেখে চেনাই যেত না। ব্যস্ত কর্পোরেট। বউ, ছোট মেয়েকে সময় দিতে পারত না। কখন যেন অভিষেক বন্ধু হয়ে গেল ঊর্মির। এত জটিল সম্পর্ক অমিত বুঝেও বুঝতে চায় না।

নীলাদ্রিকে বলল "কিছু খাবে?"

নীলাদ্রি বলল "উত্তরবঙ্গ যাব ভাবছি। অনেকদিন ওদের দেখি না"।

অমিত চমকে উঠল।

১৫

ঊর্মিদের কটেজে আসতে আসতে অভিষেক ভিজে গেল।

দরজা নক করতে ঊর্মি দরজা খুলল। অভিষেক বলল “চ্যাচাল কে?”

ঊর্মি তেতো গলায় বলল “তুয়া। ভয় পেয়েছে আর কী”।

তুয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। অভিষেক তুয়াকে কোলে নিতে গেল।

ঊর্মি বলল “চেঞ্জ করে হাত ধুয়ে নাও আগে। কী না কী ধরেছো”।

অভিষেক থমকে গেল। বাথরুমে গিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে টি শার্ট চেঞ্জ করে তুয়াকে কোলে নিল। তুয়া বলল “মা মারছে”।

ঊর্মি তুয়ার দিকে আগুনে চোখে তাকাল।

অভিষেক তুয়াকে কোলে নিয়ে পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বলল “আচ্ছা বাবু। কাঁদে না। আমরা মজন্তালি সরকারের গল্প শুনি এবার? কেমন? নাকি লালকমল নীলকমলের গল্প শুনবে?”

ঊর্মি গজগজ করে বলল “তুমি ও ঘরে যাও, আমি আমার মেয়েকে সামলাতে পারি”।

অভিষেক বলল “কেমন সামলাচ্ছো তা তো দেখতেই পারছি। এটুকু একটা বাচ্চাকে মারতে হচ্ছে”।

ঊর্মি বলল “বেশ করব। আমার মেয়ে, আমি যা ইচ্ছা করব”।

অভিষেক খাটে বসে বলল “তা করবে কিন্তু যে রাগে তুমি ওকে মারছ, সেটা তো তুমি বলেছিলে বলেই আমি করেছি”।

ঊর্মি বলল “তুমি যেন চাও নি। প্রতি রাতে বারবার বলেছ এভাবে হয় না। লিখতে পারছ না, ইন্সপিরেশন পাচ্ছো না। আমি কী করব? তুমি না চাইলে তুমি মেয়েটাকে আনতে?”

অভিষেক তুয়ার দিকে তাকিয়ে গলা তুলে বলল “ঘরে কে জাগে?”

তুয়া হাসিমুখে চোখ বড় বড় করে বলল “লালকমলের আগে নীলকমল জাগে, আর জাগে খোলা তলোয়ার”।

ঊর্মি ক্লান্ত মুখে কাঁচের জানলার বাইরে বৃষ্টি দেখতে লাগল।

১৬

নীলাদ্রি অস্থির মুখে এয়ারপোর্টে বসে আছে।

অমিত বলল “তোমার মুভ অন করা উচিত ছিল নীলাদ্রি”।

নীলাদ্রি বিভ্রান্ত মুখে অমিতের দিকে তাকিয়ে বলল “আমি মুভ অন করে গেছি। মেয়েটার কথা মনে পড়ে। নিজের রক্ত তো”।

অমিত বলল "বেশ তো। ব্যাপারটা জটিল করার তো কোন দরকার ছিল না। অভিষেকের সঙ্গে কথা বললেও ও মেনে নেবে। খামোখা সেবার গুন্ডা পাঠাতে গেলে কেন?"

নীলাদ্রি মাথায় হাত দিয়ে বলল "ভুল হয়ে গেছে। আমার আসলে মাথা কাজ করে না। নিজেকে কেমন হেরে যাওয়া মানুষ মনে হয়। মনে হয় রাস্তায় সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বউ পালানো মানুষ মানেই তো হাসি ঠাট্টার জিনিস, তাই না?"

অমিত বলল "কিছুই তাই না। তুমিও একটা ভাল দেখে মেয়ে দেখে জমিয়ে প্রেম করতে। জ্বলে যেত ঊর্মি"।

নীলাদ্রি বলল "চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অপরাধী মনে হয় নিজেকে মেয়ের মুখটা মনে পড়লে"।

অমিত বলল "রাবিশ, চল বিয়ার খাই"।

নীলাদ্রি উঠল। দুজনে বিয়ার পাবে গিয়ে বসল। এক সুন্দরী বেশ আগ্রহী মুখে অমিতের দিকে তাকিয়ে আছে। অমিতের চেনা চেনা লাগছিল। এগিয়ে গিয়ে বলল "আমি কি আপনাকে কোথাও দেখেছি?"

মেয়েটি বলল "আমি অভিনয় করি। আপনার গল্প নিয়ে রিসেন্ট যে সিনেমাটা ফ্লপ করল, আমি তার হিরোইন ছিলাম"।

অমিত মুখ কুঁচকে বলল "ঈশ, আপনার কেরিয়রটা ফুটুর ডুম করে দিলাম বলুন"।

মেয়েটি বলল "নাহ। থ্যাঙ্কস টু ইওর সাহসী দৃশ্য। লোকজন আমাকে ভালই কাস্ট করছে এখন"।

অমিত দেখল নীলাদ্রি মাথা নিচু করে বসে আছে। সে বলল "আপনার নাম কী যেন?"

মেয়েটি বলল "তারা। তারা মালহোত্রা"।

অমিত বলল "অবাঙালি? কথা শুনে তো বাঙালিই লাগছে"।

তারা বলল "তিন পুরুষ শিলিগুড়ি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

অমিত বলল "নর্থ বেঙ্গল। আপনি?"

তারা বলল "আমিও। বাড়ি যাব"।

অমিত বলল "বেশ। আচ্ছা আমি যাই, ও একা বসে আছে"।

তারা হেসে বলল "ওকে ডাকতে পারেন এখানে। প্রবলেম নেই। একা একা বসে আছি"।

অমিত নীলাদ্রিকে ডাকল।

নীলাদ্রি এসে আগ্রহী মুখে তারাকে দেখল।

অমিত পরিচয় করিয়ে দিল।

নীলাদ্রি হাত জোর করল।

তারা বলল "আপনিও লেখেন?"

নীলাদ্রি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল "না না, আমি লিখি টিখি না। আমি একজন ব্যর্থ মানুষ। হেরে যাওয়া মানুষ"।

তারা অবাক হয়ে অমিতের দিকে তাকাল।

অমিত হাসি হাসি মুখে তারার দিকে তাকিয়ে রইল।

১৭

লাঞ্চ দিয়েছে। তুয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল। অভিষেক কোলে করে ডাইনিং রুমে নিয়ে এসেছে।

ঊর্মি আর বীথী বসেছে। অভিষেক তুয়াকে খাইয়ে দিচ্ছে। তুয়া খেতে চাইছে না, অভিষেক গল্প শোনাতে শোনাতে খাওয়াচ্ছে।

দুজন ছেলে এসেছে ডাইনিং রুমে। পরস্পরকে চুমু খাচ্ছে। খুনসুটি করছে।

গে কাপল।

ঊর্মি কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রাগী গলায় বলল "যত উলটো পালটা যায়গায় এলাম"!

অভিষেক বলল " কেন? উলটো পাল্টার কিছু নেই তো। আদর করবে এতে উল্টো পাল্টার কী আছে?"

ঊর্মি বলল "সেই তো। আমি যা বলব তার উল্টোটা তো তোমাকে বলতেই হবে"।

অভিষেক উত্তর দিল না। অনেকটা মাংস দিয়েছে। বীথী কম মাংস নিয়েছিল। ঊর্মি বেশ কয়েক পিস বীথীর প্লেটে দিয়ে বাঁকা গলায় বলল " খাও খাও। অনেক পরিশ্রম হচ্ছে তোমার।"

বীথী কিচ্ছু বলল না। যেমন খাচ্ছিল তেমন খেয়ে যেতে লাগল।

মেঘের ফাঁক দিয়ে হালকা রোদ উঁকি মারছে। অভিষেক বলল "তুয়াকে নিয়ে বেরোব। ওকে একটু পাহাড় দেখিয়ে আনি। তোমরা কেউ যাবে?"

ঊর্মি বলল "তোমরা যাও। আমি যাব না"!

অভিষেক বলল " ঠিক আছে। বীথী যাবে?"

বীথী মাথা নাড়ল।

ঊর্মি বীথীর দিকে একবার স্থির চোখে তাকিয়ে খাওয়া শুরু করল আবার।

১৮

প্লেনে অমিত তারার পাশে ম্যানেজ করে বসল। সারা রাস্তা দুজনে কথা বলল।

নীলাদ্রি হতাশ চোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বাগডোগরায় পৌঁছে অমিত নীলাদ্রিকে বলল "তারা আমাদের সঙ্গেই যাবে"।

নীলাদ্রি শ্বাস ছেড়ে বলল "তুমি শিল্পী লোক। তোমার মত হতে পারলে ভাল হত"।

অমিত বলল "তা বটে। চল। তোমার বউ খোঁজা অভিযানে বেরনো যাক"।

নীলাদ্রি বলল "ওদের খবর দিয়েছ?"

অমিত হাসল "না না। অভিষেককে মাঝে মাঝে শক ট্রিটমেন্ট দেওয়া উচিত। যেমন তোমাকে ওরা দিয়েছে, তোমার ট্রিটমেন্টটাও শকিং হওয়া উচিত তাই না?"

নীলাদ্রির চোখ জ্বলে উঠল "ঠিক ঠিক"।

লাগেজ বেল্ট থেকে ব্যাগ নিয়ে অমিত নীলাদ্রিকে দেখিয়ে তারাকে বলল "আমরা এই হেরে যাওয়া মানুষের জন্য যাচ্ছি, বুঝতে পারছ তো তারা?"

তারা হাসল "রাইট"।

অমিত বলল "অবশ্য হেরে যাওয়া মানুষের দিকে কতটা দেখব সেটা নিয়ে ডাউট আছে। তুমি এত সুন্দরী, আমি তো অন্য দিকে তাকাতেই পারছি না"।

তারা বলল "থাক। আর ফ্লার্ট করতে হবে না। পাহাড় যেতে ইচ্ছে করছে মানে এই নয় সারারাস্তা ফ্লার্ট করে যাবেন। আপনি বরং কয়েকটা কবিতা শোনাতে পারেন"।

অমিত জিভ কাটল "আমার কবিতা তো আমার নিজেরই মুখস্ত থাকে না। আচ্ছা, চেষ্টা করব, পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে তোমাকে ইমপ্রেস করার। একজন কোট আনকোট সাহসী অভিনেত্রীকে ইমপ্রেস করা কি মুখের কথা তারা?"

তারা হেসে ফেলল। নীলাদ্রি গাড়ি জোগাড় করে ফেলেছিল। তারার দুটো লাগেজ ছিল। বাকি দুজনের হ্যান্ড ব্যাগ ছাড়া কিছু নেই। ইনোভা জোগাড় করা গেছে। নীলাদ্রি সামনে বসল।

গাড়ি চলতে শুরু করল।
অমিত তারার বাঁ হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলল “তোমার হাতটা খুব নরম। যেন রূপসী বাংলা। অবশ্য জীবনানন্দ তোমাকে নিয়ে কবিতার বইই লিখে গেছেন”।
তারা অবাক হয়ে বলল “অ্যা? কী বই?”
অমিত ভরাট গলায় আবৃত্তি করল
“ আমার এ-জীবনের ভোরবেলা থেকে—
সে সব ভূখণ্ড ছিলো চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার ;
একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল
আমাদের দু–জনার মতো দাঁড়াবার
তিল ধারণের স্থান তাহাদের বুকে
আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই ;
একদিন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সাথে পথ ধ’রে
ফিরে এসে বাংলার পথে দাঁড়াতেই

দেখা গেল পথে আছে,— ভোরবেলা ছড়ায়ে রয়েছে—
দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব, উত্তরের দিক
একটি কৃষাণ এসে বার–বার আমাকে চেনায় ;
আমার হৃদয় তবু অস্বাভাবিক।

পরিচয় নেই তার,— পরিচিত হয় না কখনো ;
রবিফসলের দেশে রৌদ্রের ভিতরে
মনে হয় সুচেতনা, তোমারে হৃদয়ে
ভুল এসে সত্যকে অনুভব করে।

সময়ের নিরুৎসুক জিনিসের মতো—
আমার নিকট থেকে আজো বিংশ শতাব্দীতে তোমাকে ছাড়ায়ে
ডান পথ খুলে দিলো ব’লে মনে হ'ল,
যখন প্রচুরভাবে চ'লে গেছি বাঁয়ে।“
তারা মুগ্ধ গলায় বলল “অসাধারণ। আপনার লেখা?”
অমিত বলল “সাতটি তারার তিমির থেকে। কবিতার নাম ভাষিত। তোমার নাম অবশ্য লাবণ্য হলে ভাল হত। আমি অমিত তুমি লাবণ্য”।
তারা বলল “এই নামটা আমি শুনেছি। টেগোর, রাইট?”
অমিত হাসল।

১৯

বৃষ্টি ধরে এসেছে তবে রাস্তায় স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা আছে।
ঊর্মি হোটেলে থেকে গেছে।

অভিষেক তুয়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কোলে নিচ্ছে। রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট পাহাড়ি ফুল ফুটে আছে। সেগুলো দেখে তুয়া বায়না করছে নেওয়ার জন্য। বীথী এনে দিচ্ছে।

অভিষেক বলল "তুমি বাচ্চাদের পছন্দ কর?"

বীথী বলল "হু, করি। কে করে না?"

অভিষেক বলল "তা ঠিক। বেশিরভাগ মানুষই বাচ্চা পছন্দ করে"।

তুয়া গম্ভীর গলায় বলল "আমি বাচ্চা পছন্দ করি না"।

বীথী শব্দ করে হেসে উঠল।

অভিষেক তুয়াকে বলল "তাহলে তুমি বুড়ো পছন্দ কর মা?"

তুয়া মাথা নেড়ে বলল "আমি কাউকে পছন্দ করি না"।

অভিষেক তুয়াকে কোলে নিল। বীথী বলল "এই প্রথম এরকম হল। কোন অ্যাসাইনমেন্টে কারো ফ্যামিলির সঙ্গে এলাম। ইউনিক এক্সপেরিয়েন্স"।

অভিষেক বলল "তা বটে। আগেকারদিনে রাজারাজরারা করত। বেড়াতে যেত, সঙ্গে পত্নী, উপপত্নী, রাঢ়, সব জুটিয়ে নিয়ে যেত"।

বীথী বলল "এস টি ডির জন্য প্রি কশান নিতেন না ওরা। যার ফলে তখনকার দিনে সব থেকে ভুগতেও হত বেশি"।

অভিষেক অবাক গলায় বলল "তুমি বেশ অ্যাওয়ার তো এই ব্যাপারে"।

বীথী হাসল "একটা এন জি ও আমাদের নিয়ে ক্লাস করায় মাঝে মাঝে"।

তুয়া বলল "এস টি ডি কী বাবা?"

অভিষেক জিভ কাটল। বলল "কিছু না মা। বড়দের ব্যাপার। তুমি চকলেট খাবে?"

তুয়া ঘাড় নাড়ল।

পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে অনেকটা চলে এসেছিল তারা।

একটা গাড়ি তাদের পেরিয়ে খানিকটা গিয়ে দাঁড়াল।

অভিষেক থমকাল।

দেখল গাড়ি থেকে নীলাদ্রি আর অমিত নামছে।

তুয়া অভিষেকের কাঁধ খামচে ধরে বলল "ওই বাজে লোকটা আবার এসেছে বাবা। মারো ওকে, মারো"।

২০

অভিষেক নীলাদ্রির দিকে তাকাতে পারে না। তার লজ্জা হয়। এককালে বন্ধুই তো ছিল।

পরিস্থিতিটা তার কাছে অস্বস্তিকর। তুয়া তাকে শক্ত করে ধরে আছে। অমিতের পেছন পেছন তারা নামল গাড়ি থেকে। অভিষেকের অমিতের ওপর রাগ হচ্ছিল। একবার তাকে ফোন করে এলে কী হচ্ছিল?

নীলাদ্রি বিহ্বল গলায় তাকে বলল "ঊর্মি কোথায়?"

অভিষেক বলল "হোম স্টেতে আছে। তুই কি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিস?"

নীলাদ্রি বলল "তুয়ার কথা মনে পড়ছিল আর কী"।

অভিষেক তুয়াকে বলল "যাও, ওর কাছে যাও"।

তুয়া জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

অমিত বলল "এখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় না?"

অভিষেক তারার দিকে তাকাল। মুখটা চেনা। সিনেমা করে মেয়েটা। তারা বলল “না, এখান থেকে দেখতে পাবে না। ভিউটা উল্টোদিকে”।

অমিত বলল “আমি আর তারা তাহলে এগোই। তোরা কথা বল?”

অভিষেক বলল “একদম না। তুই এখানে থাক। নীলাদ্রিকে এখানে নিয়ে এলি কেন? মজা দেখার জন্য?”

অমিত তারার দিকে তাকিয়ে বলল “এই যে দ্য ফেমাস পোয়েট অভিষেক। চেনো তো?”

তারা মাথা নাড়ল। অভিষেক বলল “তুই ঠিক কী চাইছিস বলবি?”

অমিত বলল “নীলাদ্রি বলল এখানে আসবে। আমিও চলে এলাম। তোর এক্সপেরিমেন্ট উইথ লাইফটা দেখার আগ্রহটাও ছিল আর কী। তোমার নাম কী?”

অমিত বীথীর দিকে তাকিয়ে গলা তুলল।

বীথী নাম বলল। নীলাদ্রি তৃষ্ণার্তের মত মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

অভিষেকের নীলাদ্রির জন্য খারাপ লাগল হঠাৎ করে।

মেঘলা পাহাড় বলেই হয়ত।

অমিতকে বলল “তোরা বীথীকে নিয়ে হোমস্টেতে যা। আমি নীলাদ্রির সঙ্গে যাচ্ছি”।

অমিত বলল “মারপিট করবি নাকি? ডুয়েল লড়া হবে? তাহলে আমিও থেকে যাব”।

অভিষেক রাগী চোখে অমিতের দিকে তাকাল। অমিত হাত তুলল “ওকে ওকে, বীথী, চল আমাদের সঙ্গে। একটা রুম চাই। আমার আর তারার জন্য। পাব তো রে?”

অভিষেক বলল “জানি না”।

অমিত কাঁধ ঝাঁকাল। “ঠিক আছে। আমরা এগোই। বীথী এসো”।

বীথী বলল “আপনারা যান। আমার হাঁটতে ভাল লাগছে”।

অভিষেক বীথীর দিকে তাকিয়ে বলল “তুমি থাকবে?”

বীথী মাথা নাড়ল।

অমিত তারাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অভিষেক নীলাদ্রিকে বলল “তুই খেয়েছিস কিছু?”

নীলাদ্রি মুগ্ধ চোখে তুয়াকে দেখছিল। শুনতে পেল না প্রথমটা। অভিষেক আবার বলল।

নীলাদ্রি বলল “না। লাঞ্চই হয় নি এখনও”।

অভিষেক বলল “ঠিক আছে। চল। হাঁটি”।

তুয়া অভিষেকের ঘাড়ে মুখ গুঁজে আছে। অভিষেক নীলাদ্রিকে বলল “ও বীথী। আমাদের সঙ্গে এসেছে”।

নীলাদ্রি বিহ্বল গলায় বলল “ওহ, তাহলে কি আর ঊর্মিকে তোর আর দরকার নেই? ফেরত নিয়ে যাব?”

অভিষেক নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল “তুয়া তোর কাছে থাকতে চাইবে না”।

নীলাদ্রির মুখটা নিমেষে ছাই হয়ে গেল। তুয়াকে বলল “তোর বাবা কিন্তু আমি জানিস তো মা?”

তুয়া বলল “তুমি পচা। বাজে লোক”।

নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার ওপরে। অভিষেক তুয়াকে বলল “একটু যাও মা, আমি আবার কোলে নেব তোমায়”।

তুয়া জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল “না। যাব না”।

নীলাদ্রি বলল “থাক, থাক। ছেড়ে দে”।

বীথী একটা কথাও না বলে চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল।

অভিষেক বলল “তুই এখানে না এলেই পারতিস। অমিতের উচিত ছিল তোকে আমাদের হদিস না দেওয়া। কলকাতায় দেখা করে নিতিস ওদের সঙ্গে। তোকে তো আমি কখনও বারণ করি নি”।

নীলাদ্রি বলল "ঊর্মি ভাল আছে অভিষেক"?

অভিষেক চুপ করে গেল। এ কথার কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না।

২১

"পাহাড় তোমায় কতটা টানে তারা?"

অমিত আনমনে প্রশ্নটা করল।

তারা বলল "সারাক্ষণ। কলকাতায় এসে বিজি হবার কিছুদিন আগেও তো বন্ধুরা মিলে বাসে উঠে চলে আসতাম। কোনদিন দার্জিলিং, কোনদিন কালিম্পং। গ্যাংটকও যেতাম"।

অমিত বলল "উইথ বয়ফ্রেন্ড বুঝি?"

তারা তার মুক্তোর মত দাঁত বের করে হেসে বলল "ছিল একজন। তার বাইকে করে অনেকটা চলে আসতাম। একবার বাড়িতে জানতে পেরে খুব বকাঝকা করল। কী মনে হল, ছেলেটা ব্রেক আপ করে দিল"।

গাড়ি কালিম্পং ছাড়িয়ে এগোচ্ছে। গাড়িতে উঠেই অমিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন অভিষেকদের ব্যাপারে থাকবে না। ওখানে থাকা মানেই ওদের টানাপোড়েনের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে নেওয়া। কোথায় যাবে এখনও ঠিক হয় নি তবে ড্রাইভার বলেছে সন্ধ্যের আগে লাভা পৌঁছে যাবে।

অমিত বলল "বয়ফ্রেন্ডরা অভিমানী হলে তো বড় বিপদ। বয়ফ্রেন্ড হবে হিম্মতওয়ালার জিতেন্দ্রর মত। সিংঘমের অজয় দেবগণের মত, শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদের বুম্বাদার মত..."

তারা হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল "এর মধ্যে বুম্বাদাকে ঢুকিয়ে দিলে?"

অমিত হাত নেড়ে বলল "না না, তুমি বুঝছ না, আমি কাউকে ঢোকাচ্ছি না। বলছি মিনমিনে বয়ফ্রেন্ড জিনিসটা আমার পোষায় না। অবশ্য আমি স্ট্রেট। সেক্ষেত্রে মিনমিনে গার্লফ্রেন্ড পোষায় না বলতে পারো"।

তারা বলল "আচ্ছা। তুমি কি কোনভাবে আমার বয়ফ্রেন্ড হবার জন্য আমাকে ইম্প্রেস করার চেষ্টা করছ?"

অমিত জিভ কেটে বলল "একেবারেই না"।

তারা বলল "একেবারেই না? ওহ, বাড়ি বুঝি খুব কনজারভেটিভ? ছেলে ইন্ডাস্ট্রির কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে হই চই লেগে যাবে?"

অমিত বলল "ধুত্তোর বাড়ি। বাড়ির চিন্তা কে করে? আমি নিজের চিন্তা করি। তোমাকে গার্লফ্রেন্ড করার বিপদ অনেক। এক তুমি সুন্দরী। আর আমি এক ব্যর্থ কবি। এক লাইন লিখে দশ লাইন কাটি। অন্যধারার বাংলা সিনেমা করে ব্যাপক ঝাড় খেয়েছি। এদিকে তুমি কেরিয়রের টপে আছো। আমাদের হবে না ওসব। একদিন ওসব হয়ও না"।

তারা চোখ বড় করল "তাই বুঝি? একজন কবি বুঝি এত হিসেব মেনে চলে? এত প্র্যাক্টিকাল হয়?"

অমিত বিড় বিড় করে বলল "ভালোবাসা বাঁধা পড়ে থাকে আত্মসমর্পণকারী সৈনিকের সঙ্গে..."

তারা বলল "মানে?"

অমিত বলল "মানে কিছু না। আমরা কি একটা ঘরেই থাকব?"

তারা গলায় কৌতুক এনে বলল "কেন? সমস্যা কোথায়? একটা অবলা নারীকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসে এখন একা রাখার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বুঝি?"

অমিত তারার দিকে তাকিয়ে বলল " এই আকাশ ঘেরা রাস্তায় তুমি নিমীলিত চোখে, বসে থাকো একা কোন গহীন সঘনে, ভালবাসা নতজানু..." থেমে গিয়ে হতাশ গলায় অমিত বলল "ধুস। আমার লেখা শেষ হয়ে আসছে"।

তারা বলল “লেখার ক্ষমতা রিস্টোর কিভাবে হবে?”
অমিত হেসে বলল “ত দিয়ে শুরু এমন কোন শিলিগুড়িনিবাসী মেয়ের সঙ্গে দীর্ঘ একটি চুমু খেতে হবে”।

২২

ঊর্মি ব্যাগ গোছাচ্ছিল। যখন কোন কাজ না থাকে তখন ব্যাগটাই গোছায় সে বসে বসে। পরিপাটি রাখা জামা কাপড় আরও একবার গুছিয়ে ব্যাগে রাখে। কাজ না থাকলে কাজ তৈরী করে নেওয়া।

হোম স্টের মালিকের একটা বিরাট কুকুর আছে। সেটা ঘরের সামনে ঘুরে গেছে একবার। ঊর্মি কুকুর ভয় পায়। দরজা বন্ধ করে রেখেছিল তার কটেজের।

বেল বাজল। ঊর্মি দরজা খুলে স্থির হয়ে গেল। নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে অভিষেক আর বীথী।

ঊর্মি কয়েক সেকেন্ড নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল “ভেতরে এসো”।

নীলাদ্রি কোন কথা না বলে কটেজের মধ্যে এসে বসল। অন্যমনস্ক গলায় বলল “শহরটা অসহ্য হয়ে উঠছে আমার কাছে”।

অভিষেক তুয়াকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

বীথী তাদের কটেজে চলে গেছে।

নীলাদ্রি বলল “ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি এখানে এলাম বলে। কিন্তু কিছু করার ছিল না আমার। আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি ঊর্মি”।

ঊর্মি শান্ত গলায় বলল “আমরা সবাই কিছু না কিছু শতাংশ পাগল। তুমি তো বরাবারই পাগল”।

অভিষেক বলল “তুয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি বরং ওই রুমে...”

ঊর্মি অভিষেকের দিকে সরাসরি তাড়িয়ে বলল “তোমাকে তো কাপুরুষ বলে জানিনি কোন দিন”।

অভিষেক থমকে গেল। বলল “আমার মনে হয় নীলাদ্রি তোমার সঙ্গে কোন একটা বোঝাপড়া করতে এসেছে। এখানে আমার না থাকলেও হয় বোধ হয়”।

ঊর্মি বলল “একবস্ত্রে যেদিন ওকে ছেড়ে তোমার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম তখন জিজ্ঞেস করতে পারতে। এখন কি এতটাই বোঝা হয়ে গেছি আমি?”

অভিষেক নীলাদ্রির দিকে তাকাল। নীলাদ্রি হঠাৎ বলল “আমায় একটা শাল দিতে পারবে ঊর্মি? ঠান্ডার কথাটা ভুলে গেছিলাম। খুব ঠান্ডা লাগছে যে”!

২৩

নীলাদ্রি বসে আছে শাল জড়িয়ে। তুয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

ঘুমের মধ্যেই তুয়া সে হাত সরিয়ে দিল।

নীলাদ্রি বলল “মেয়েটা আমাকে একদম সহ্য করতে পারে না”।

ঊর্মি বলল “তুমি এখানে এসে ঠিক কী করতে চাইছ নীলাদ্রি?”

নীলাদ্রি একবার অভিষেক, আরেকবার ঊর্মির দিকে তাকিয়ে বলল “আমি আর কী করতে পারি বল। আমি তো একজন হেরে যাওয়া মানুষ”।

অভিষেক কী বলবে বুঝল না। নীলাদ্রির নুইয়ে পড়া প্রতিবার তাকে ধাক্কা দেয়। মারপিট করতে পারে, অজস্র গালাগাল দিতে পারে, কিচ্ছু করবে না। শুধু মাথা নিচু করে বসে থাকবে। তার অফিসে এসেও মাঝে মাঝে এরকম করে বসে থাকে।

ঊর্মি ব্যাগের চেন আটকে খাটে চুপ করে বসে বলল “হেরে যাওয়া জিতে যাওয়া এভাবে হয় না। তুমি আবার নতুন করে শুরু কর”।

নীলাদ্রি মাথা নাড়ল, "ধুস, আমি রিজেক্টেড মাল। বউ মরে গেলে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায়, কিন্তু বউ পালালে..."

ঊর্মি বলল "তুমি কি আমার মৃত্যু কামনা কর?"

নীলাদ্রি শিউরে উঠল "একদম না। তোমার কিছু হলে তুয়াকে কে দেখবে?"

ঊর্মি অভিষেকের দিকে তাকিয়ে তেতো গলায় বলল "সে দেখার অনেক লোক আছে"।

নীলাদ্রি অভিষেককে বলল "কেন? এরকম কেন? তোদের ভালবাসারও কি এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়েছে?"

অভিষেক বলল "ঊর্মি সেক্সুয়ালি ফ্রিজিড হয়ে গেছে নীলাদ্রি। ওকে এখন আর কোন কিছু জাগায় না"।

নীলাদ্রি ঊর্মির দিকে কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে বলল "তাতে? তাতে কী হয়? শরীরটাই সব?"

অভিষেক বলল "না, তা নয়। কিন্তু কিছুটা তো বটেই। তুই এখন ঊর্মিকে ফিরিয়ে নিয়ে বিনা যৌনতায় বাকি জীবনটা কাটাতে পারবি তো?"

নীলাদ্রি বিস্ফারিত চোখে অভিষেকের দিকে তাকিয়ে বলল "আমি তো ঊর্মিকে ভালোবাসি কি না জানিনা, কিন্তু যেদিন টেবিলের ওপর চিঠিটা দেখলাম, তারপর থেকে আমি মরে গেছি অভিষেক। সেক্সের কথা তো ভাবি নি কোন দিন!"

ঊর্মি বলল "ভাবো ভাবো। আমি তোমার থেকে দূরে চলে গেছিলাম বলে তুমি আমাকে ভালোবাসোনি। তুমি ভালবেসেছিলে নিজের ইগোকে। এখনও তাই বাসো। দিনের পর দিন অফিসের মিটিঙে ব্যস্ত থেকে, সংসার পরিবারকে দূরে রেখে তুমি কোন দিন আমার কথা ভাবো নি নীলাদ্রি। তুমি তখনও নিজের কথা ভেবেছিলে। এখনও নিজের কথাই ভেবে এসেছো। সবাই হাসবে তোমার বউ পালিয়েছে বলে, সেই ইগো থেকে এসেছো। রাতে ঘরে ফিরে এসে আমার ঘুমিয়ে থাকা শরীরটায় দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছো। আমি না চাইতেও করেছো। তখন তুমি একবারও আমার কথা ভাবো নি। যোনি ছাড়া মেয়েদের তোমরা কোনদিন কোন কিছু ভাবতে পারো নি। আমিই বোকা ছিলাম, সে সময় অভিষেকের সঙ্গে চলে গেলাম। ভালবাসা পাওয়া অত সহজ না, তখন বুঝিনি। এখনও বুঝিনি হয়ত"।

নীলাদ্রি মাথা নিচু করে বসে রইল।

কলিং বেল বাজল।

অভিষেক দরজা খুলে দেখল অমিত তারাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অমিত বলল "ধ্বস নেমে গেছে। গাড়ি কোন দিকেই যাচ্ছে না। আর তো ঘরও নেই এখানে রাতের মত। এই দুটো ঘরে সবাই মিলে থেকে যাই আজ রাতটা? কী বলিস?"

২৪

ঊর্মি থমথমে চোখে অভিষেকের দিকে তাকাল।

অভিষেক ইতস্তত করে বলল "রুম নেই বলল?"

অমিত বলল "হ্যাঁ। বলল খুব বেশি হলে এক্সট্রা বেড দিতে পারি। কাল দুপুরের আগে রোড ক্লিয়ার হবার চান্স কম। যে লেভেলে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই তারা, ভেতরে এসে বস"।

তারা খানিকটা সংকুচিত হয়ে রুমের ভিতরে এল। অমিত অবশ্য স্বাভাবিক। তারাকে খাটে বসতে বলল। নীলাদ্রিকে দেখে বলল "কী বস? তোমার সব মিটল?"

নীলাদ্রি বিহ্বলভাবে অমিতের দিকে তাকিয়ে বলল "ওই আর কী"।

অমিত অভ্যস্ত হাতে সিগারেট বের করতে যাচ্ছিল, ঊর্মি কড়া গলায় বলল "এখানে স্মোক করবে না, তুয়া আছে"।

অমিত জিভ কাটল, "ঠিক ঠিক। এক্কেবারে সরি"।

ঊর্মি বলল "তা নীলাদ্রিকে এখানে তুমি কেন নিয়ে এলে? প্রতিবারের মত এবারেও মজা দেখার জন্য?"

অমিত বলল "তুমি সব সময় এত সিরিয়াস কেন ঊর্মি? এত সুন্দর একটা ওয়েদার, পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে, কোথায় চিকেন, হুইস্কি নিয়ে বসে জমিয়ে পার্টি হবে, তা না। কেমন একটা মুড অফ করে বসে আছো। তুমি তো এরকম ছিলে না! দিনে দিনে এরকম খেকুরে হয়ে যাচ্ছো কেন?"

ঊর্মি কঠিন গলায় বলল "তুমি কী আশা কর তবে? আমার এক্স হাজব্যান্ডের সামনে এখানে মুজরো করব বুঝি?"

নীলাদ্রি খুক খুক করে কেশে বলল "অভিষেক, আরেকটা রুম আছে না? আমি বরং ওখানে যাই"।

অমিত জোরে হেসে উঠে বলল "হ্যাঁ, তাই যাও বরং। এসকর্ট আছে ও ঘরে, তুমি ওখানে গিয়ে লাইফটা রিস্টার্ট কর"।

অভিষেক তারার দিকে তাকাল। তারা কোন দিকে না তাকিয়ে মন দিয়ে মোবাইল ঘেঁটে যাচ্ছে।

সে বিরক্ত মুখে নীলাদ্রিকে বলল "নীলাদ্রি তুই ওই ঘরেই যা। বীথী বরং এখানে আসুক। মেয়েরা এই রুমে ঘুমোক"।

ঊর্মি বলল "আমি একটা বেশ্যার সঙ্গে এক ঘরে আমার মেয়েকে নিয়ে থাকতে পারলাম না, সরি"।

তারা ঊর্মির দিকে তাকিয়ে বলল "বেশ্যা একটা ফালতু টার্ম। সবাই বেশ্যা। আপনার ইচ্ছা না থাকলেও আপনি বরের সঙ্গে যেদিন জোর করে শুয়েছেন সেদিন আপনিও বেশ্যা হয়েছেন। আমি কাজের জন্য যখন প্রোডিউসারের সঙ্গে শুয়েছি, সেদিন আমিও বেশ্যা হয়েছি। এভাবে বেশ্যার ক্লাসিফিকেশন করা যায় নাকি?"

ঊর্মি হাতের ব্যাগটা মেঝেতে টান মেরে ফেলে দিয়ে চেয়ারের ওপর বসে পড়ে বলল "যা পারো কর। আমি আর কিছু জানি না"।

নীলাদ্রি ঊর্মির দিকে তাকিয়ে বলল "আমি বোধহয় তোমাকে খুব সমস্যায় ফেলে দিলাম তাই না"?

২৫

ডিনার টেবিলে সবাই এসেছে। রুমের সমস্যা থাকলেও খাবারের ব্যবস্থা হোম স্টে থেকে করা হয়েছে। ঊর্মি রুমে থেকে গেছে তুয়া ঘুম থেকে ওঠে নি বলে। ঠিক হয়েছে অভিষেক ঊর্মির খাবার নিয়ে যাবে।

অভিষেক বীথীকে নিয়ে বসেছে। তাদের সামনে অমিত আর তারা।

নীলাদ্রি চুপ করে বসে রয়েছে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

অমিত নীলাদ্রিকে বলল "কী বস? ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?"

নীলাদ্রি বলল "কবি? আমি কবিতা লিখতে পারি না যে"।

অমিত বলল "কবিতা কি লিখলেই কবি হয় নাকি কেউ? কেউ কেউ সারাজীবন লিখেও কবি হতে পারে না। আমাকেই দেখো না"।

নীলাদ্রি বলল "কী যে বল,এসব কথা বললে কেউ শুনবে?"

একটু দূরের টেবিলে একজন মহিলা এসে তারার সঙ্গে সেলফি নিয়ে গেল। অমিত বলল "এই দেখো। এখানে তোমার কথা মত দুজন কবি বসে আছে কিন্তু সেলিব্রিটি কিন্তু সেই তারাই হল। এর মানে কী?"

তারা বলল "লেগ পুল কোর না আর। তোমাদের সবাই চেনে"।

খাবার দিল। বীথী চুপ করে খেতে শুরু করল।

অভিষেক বলল "কত প্ল্যান করে এসেছিলাম। কিছুই লেখা হল না। আর বোধ হয় কোন দিন লিখতে পারব না"।

অমিত বলল “লিখতে না পারলে ভাল তো। আমি একাই থাকব, সূর্য হয়ে জ্বলব। অবশ্য আর সূর্য হব কী, আমার নিজেরই তো লেখা বেরোয় না আজকাল। তারাকে দেখে কিছু বেরোতে পারে। দেখা যাক। আচ্ছা, তারাকে দেখেই কি লেখা হয়েছিল আকাশ ভরা সূর্য তারা? তাহলে আকাশ আর সূর্য কোথায়? তারা, তোমার কোন ভাই আছে এই দুজনের নামে?”

তারা বলল “তুমি এত টকেটিভ জানতাম না তো”।

অভিষেক বলল “অমিত যখন অপরাধবোধে ভোগে তখন ভাট বকতে শুরু করে। ও এখন তীব্র অপরাধবোধে ভুগছে নীলাদ্রিকে এখানে নিয়ে এসে”।

তারা অমিতের দিকে তাকাল “রিয়েলি?”

অমিত মাথা নাড়ল, “আমি শিওর নই। হতে পারে। ইনফ্যাক্ট মজা দেখতে এসেছিলাম অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু আমার ঊর্মির কথা ভাবা উচিত ছিল”।

অভিষেক বলল “ভাবিস নি যখন, তখন এখন আর ভাবতে হবে না”।

নীলাদ্রি বলল “আমারও দোষ আছে, না এলেই ভাল হত”।

অমিত বলল “হ্যাঁ, আমরা সবাই দোষী আমাদের এই দোষীর রাজত্বে”।

বিকট শব্দে বাজ পড়ল একটা।

বীথী ভয় পেয়ে এঁটো হাতেই অভিষেকের ডান হাত শক্ত করে ধরল।

২৬

বৃষ্টির মধ্যেই খাবার নিয়ে এল অভিষেক।

ভিজে গেছিল ঊর্মি বললো "বৃষ্টি থামলে আসতে পারতে"!

অভিষেক বলল "কখন থামবে তার কোন ঠিক আছে?"

ঊর্মি কিছু বলল না। অভিষেক টাওয়েল নিয়ে মাথা মুছে বলল "তুমি তুয়াকে নিয়ে এখানেই থাকো। বাকিরা ওই কটেজে থাকবে। সব এখানে থাকলে তুয়ার ঘুম হবে না"!

ঊর্মি টেবিলে খাবার রেখে বলল " তুয়াকে ডেকে দাও। খাক কিছু"।

অভিষেক তুয়াকে ডাকতে গেল। তুয়া ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল। অভিষেক বলল "ছেড়ে দাও। ও ঘুমাক। তুমি সকালে উঠে খাইও। সন্ধ্যেয় চাউ খেয়েছে তো"!

ঊর্মি বলল " তুমি অমিতকে কিছু বলছ না কেন? ওকে নিয়ে চলে এল?"

অভিষেক বলল "কী বলব? ওকে বলে কোন লাভ হয় কোনদিন?"

ঊর্মি বলল "জঘন্য সিচুয়েশন তৈরী হল একটা"!

অভিষেক চুপ করে রইল।

২৭

রাত দশটা।

মেঝেতে বিছানা করা হয়েছে। খাটে বীথী আর তারা শোবে। নিচে অভিষেক, নীলাদ্রি আর অমিত।

হোম স্টের এক ছেলেকে ধরে হুইস্কি আনিয়েছে অমিত।

বীথী, তারা, অমিত গ্লাসে মদ নিয়ে খেতে শুরু করেছে।

নীলাদ্রি অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে। অভিষেক বারান্দায় চেয়ারে বসে সিগারেট খেতে খেতে বৃষ্টি দেখছে।

বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। শীত আছে। অমিত ডাকল "কী রে, আয়"।

অভিষেক বলল " তোরা খা"।

অমিত বলল "বৃষ্টি দেখে কি কবিতার ইন্সপিরেশন নিচ্ছিস? আমার তো গান আসছে। তাও রগরগে। টিপটিপ বরসা পানি। উফ, রবিনা!"

অভিষেক উত্তর দিল না।

নীলাদ্রি বীথীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল "আপনি নাচ জানেন?"

বীথী বলল "মুজরো? না স্ট্রিপটিজ?"

নীলাদ্রি ভয় পেয়ে বলল "না না সেসব না। ভারত নাট্যম"।

বীথী বলল " স্ট্রিপটিজ জানি। দেখবেন?"

নীলাদ্রি সভয়ে দুদিকে মাথা নাড়ল।

অমিত বলল " তুমি তো পারভার্ট আছো মাইরি। টিপ টিপ বরষার সাথে তোমার ভারতনাট্যম দেখতে ইচ্ছা করছে?"

নীলাদ্রি বলল "না আসলে আমি টিপ টিপ বরষা শুনিনি। ওনাকে এমনিই বললাম। ওনার ফিগারটা সুন্দর। ডান্সারের মত। ঊর্মির ফিগারও এরকম ছিল"!

অমিত খুক খুক করে কাশতে শুরু করল।

অভিষেক ঘরে এসে বসে বলল " বৃষ্টি হচ্ছে কোথায় বৃষ্টির গান হবে, তা না, মাথায় শুধু আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে বাজছে। মাথাটা গেছে আমার"।

অমিত বলল "পরের মেয়ের বেবিসেটিং করলে এই হয়।"

অভিষেক রেগে গেল "তুই কি চাস আমি রেগে গিয়ে তোকে মারধোর করি? অনেকক্ষণ ধরে দেখছি পিঞ্চ করে যাচ্ছিস"।

অমিতের এক পেগ শেষ হয়ে গেছিল। দ্বিতীয় পেগ বানাতে বানাতে বলল "সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট করছি। আমি দেখতে চাইছি কোন থ্রেশোল্ড পয়েন্টে গিয়ে তুই আমার ওপর হাত তুলিস"।

নীলাদ্রি বলল "আমার কন্যা রাশি। নরম মানুষ। নইলে আমারই বোধহয় অভিষেককে পেটানোর দরকার ছিল।"

অমিত হো হো করে হেসে উঠল।

পরক্ষণেই তারার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে বলল "হোয়াট আ নাইট। আজ রাতে কেউ আর ঘুমাব না"!

২৮

রাত দেড়টা। বৃষ্টি থেমেছে।

“রাত জাগব”, “রাত জাগব” বলে সব থেকে বেশি লাফালাফি করেছিল অমিত। সবার আগে সেই ঘুমিয়ে পড়েছে। নীলাদ্রি তিন পেগে আউট হয়ে বাথরুমের দরজার কাছে ঘুমিয়েছে। বীথী আর তারা খাটে শুয়েছে। অভিষেকের বসে থাকা অবস্থাতেই ঘুমাচ্ছিল।

তার ঘুম ভাঙল হঠাৎ করে।

মাথা ঝিম ঝিম করছে হুইস্কির প্রভাবে। বেশ কয়েক মিনিট চুপ করে বসে থেকে অভিষেক উঠে নীলাদ্রির গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে ব্যালকনিতে চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল।

পাইন বনের মধ্যে কটেজগুলো। বৃষ্টির ফলে চতুর্দিক ভেজা। দূরে কোথাও কুকুর ডাকার শব্দ ভেসে আসছে।

অভিষেক মনে মনে লিখতে চেষ্টা করল

“এখানে রাত হঠাৎ চলে আসে,

ভালোবাসাগুলো যেভাবে চলে যায়...”

ভালোবাসা চলে যায়? অভিষেক ভাবতে চেষ্টা করল স্বরলিপির কথা। প্রথম কষ্ট। বিচ্ছেদ এত যন্ত্রণাদায়ক কেন? এই জেনারেশনের বিচ্ছেদে কষ্ট হয়? নাকি সবটাই সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে আজকাল কম হচ্ছে?

ঊর্মিদের কটেজের আলো জ্বলে উঠল।

অভিষেক অবাক হল। দেখল ঊর্মি তাদের কটেজের দিকেই আসছে।

সে চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে গেল। বলল “কী হল?”

ঊর্মি বলল “ঘুম আসছে না। জানলা দিয়ে তোমাকে দেখলাম”।

অভিষেক বলল “তবু। তুয়া একা আছে তো”।

ঊর্মি বলল “তুমি আমাদের ওখানে চল। এখানে এত জনের সঙ্গে ঘুমাতে কষ্ট হবে”।

অভিষেক ঊর্মির দিকে তাকাল। কোন কোন দিন আসে যেদিন, অনেক চেনা মানুষকেও ভীষণ অচেনা লাগে।

#

হুইস্কির ঘোর ছিল।

অচেনা ঊর্মির মাঝরাতে প্রবল ভালোবাসা ছিল।

অভিষেকের যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল ন'টা। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়ছে।

আকাশ একেবারে পরিষ্কার। একটুও মেঘ নেই।

চোখ খুলতেই তুয়া বলল “গুডমর্নিং বাবা”।

অভিষেক বলল “গুড মর্নিং”।

ঊর্মি পাশে ঘুমাচ্ছে তাকে জড়িয়ে ধরে।

অভিষেক উঠে বসল। তুয়াকে ব্রাশ করাল। নিজে ব্রাশ করল।

তুয়াকে কোলে নিয়ে অমিতদের কটেজের দিকে রওনা দিল।

কটেজ ফাঁকা।

দরজা খুলে অভিষেক দেখল কেউ নেই। বিছানা পরিষ্কার করে রাখা।

অবাক হল অভিষেক। কী করবে বুঝতে পারল না।

তুয়া বলল “বাবা,আন্টি কোথায়?”

অভিষেক বলল “জানি না মা। বুঝতে পারছি না”।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল দেখল খাটের পাশে টেবিলে অ্যাস্ট্রে চাপা দেওয়া একটা কাগজ।

অভিষেক এগিয়ে গিয়ে কাগজটা নিল।

“ভাই অভিষেক,

আমি একজন হেরে যাওয়া মানুষ, যে নিজের বউকে কোনদিন সময় দিতে পারি নি। দিনের পর দিন বাড়ি ফিরে ঊর্মির সঙ্গে অশান্তি করেছি। তুই যেদিন ঊর্মি আর তুয়াকে নিয়ে চলে গেলি আমার খুব রাগ হয়েছিল। কিন্তু আমি তো রাগ দেখাতে পারি না। কারো সঙ্গে ঝামেলাও করতে পারি না। কেঁদেছিলাম। পাগলের মত হয়ে গেছিলাম।

চাকরি ছেড়ে দিলাম। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকতাম। আর প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারতাম একা একা থাকলে কেমন লাগে। ঊর্মির কেমন লাগত।

এখানে এলাম বলেই তো বুঝলাম ভাই, ঊর্মি আর আমার কোন দিন হতে পারবে না। কিছু বলে নি। তুইও বলিস নি। তবু বোঝা যায়। কোন পরিবারকে বাইরে থেকে দেখলে যেমন বোঝা যায়, সে পরিবারটা

আমার না, অন্য কারো। তারা সুখে আছে, আমাকে দেখলে তারা ভালভাবে নিচ্ছে না। আমি সেখানে অবাঞ্চিত।

তুই যখন কাল আমার গায়ে কম্বলটা দিলি তখনই আমার ঘুম ভেঙে গেছিল। চুপ করে শুয়ে ছিলাম। আমি নিঃশব্দে দেখলাম ঊর্মি কেমন যত্ন করে তোকে নিয়ে গেল। এই মেয়েটা আমার বউ ছিল, এ জন্মে না বোধ হয়। আগের কোন জন্মে। আমি দেখলাম তোদের। এবার আর কাঁদলাম না।

বরং খুশি হলাম। এবার আমি নিশ্চিত হলাম, ঊর্মি যা করেছিল। ঠিক করেছিল।

আমি বীথীকে নিয়ে চললাম রে। দেখি আরও কোন দুর্গম জায়গায় যেতে পারি নাকি।

লাইফটা রিস্টার্ট করা দরকার।

তোর আশা করি বীথীকে এখন আর লাগবে না।

অমিত জানিয়ে দিল ওও পালাল। তোরা ভাল থাকিস।

তুয়ার বাবা তুইই। আমি না। বায়োলজিকাল বাপ হলেই বাপ হওয়া যায় না।

কবিতা লিখিস, আর যাই করিস।

ঊর্মিকে ভাল রাখিস। মেয়েটার তুই ছাড়া আর কেউ নেই।

নীলাদ্রি।

পুনশ্চ- আমার বউ নিয়ে পালিয়েছিলিস। তাই শাস্তিস্বরূপ বীথীর এজেন্সীতে যদি এক্সট্রা কোন টাকা লাগে দিয়ে দিস।

কোন ভাঙনের পথে এলে

দিন- ১

গাড়িটা যখন বাংলোর সামনে দাঁড়াল তখন দুপুর দেড়টা বাজে। আকাশের মুখ ভার। চারদিক অন্ধকার করে এসেছে। যখন তখন ভাসিয়ে দেবার প্ল্যান করছে।
ঠিকানাটা আরেকবার দেখল নীল । ঠিকই আছে। কেয়ারটেকার থাকার কথা একজন। একটা নাম্বারও দিয়েছিল ভাদুড়িদা।
মোবাইল বের করে ফোন করল সে। ফোন সুইচড অফ বলছে।
নীল গাড়ি থেকে নামল।
ড্রাইভারকে বলল "একটু দাঁড়ান, আমি একটু দেখি, কেউ আছে নাকি"।
ড্রাইভার গোটা রাস্তার নাছোড়বান্দা ভাবের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বলল "স্যার, এখানে কিচ্ছু নেই বিশ্বাস করুন, কত ভাল ভাল জায়গা আছে, আপনি এখানে থেকে কী করবেন?"
নীল কানে দিল না কথাটা। বাংলোর গেট খুলে ভিতরে প্রবেশ করল। বাগান ছিল এককালে। এখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জঙ্গল। শীত লাগছিল নীলের। মাফলারটা ভাল করে পেচিয়ে নিল।
"কেউ আছেন?"
বাংলোর দরজার সামনে গিয়ে জোরে হাঁক দিল নীল।
দরজায় তালা নেই। নীল আশান্বিত হল।
"আছেন কেউ?"
"সেনগুপ্ত সাহেব"?
নীল দেখল বাংলোর কোণা থেকে হাফ প্যান্ট পরা একজন বেরিয়ে এল,
"আপনি তুষারবাবু?"
"একদম, ঠিক ধরেছেন"।
"আপনার ফোন অফ কেন?"
"কী করব, কাল দুপুরে পাওয়ার কাট হয়েছে স্যার, এখনও আসে নি"।
নীল বলল "সেকী! তাহলে?"
তুষারবাবু বললেন "মোমবাতি আছে তো, চিন্তা করছেন কেন?"
মোমবাতি থাকলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এমনভাবে দাঁত বের করলেন তুষারবাবু। ভদ্রলোকের কথায় একটা পূর্ববঙ্গীয় টান আছে।
"আচ্ছা, আপনার লাগেজটা গাড়িতেই আছে তো?"
নীল বলল "হ্যাঁ"।
"চলুন স্যার, নামিয়ে নি"।
নীল আপত্তি জানাল, "না না, আপনি কেন নেবেন, আমি নামিয়ে নিচ্ছি"।
তুষারবাবু জিভ কেটে বললেন "কী যে বলেন স্যার, আপনি সাহেবের গেস্ট বলে কথা"।
ড্রাইভার ডিকি খুলে ব্যাজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল।

তুষারবাবু নীলের একটা কিট ব্যাগ আর স্যুটকেসটা নামিয়ে নিলেন।
নীল ড্রাইভারকে টাকা মিটিয়ে দিল। ড্রাইভার বলল “স্যার, ফিরবেন কী করে?”
নীল অবাক হল “কেন এখানে গাড়ি পাওয়া যাবে না?”
ড্রাইভার মাথা চুলকে বলল “পাওয়া যাবে, তবে কোন সমস্যা হয় যদি? এক কাজ করুন, আমার নাম্বারটা নিয়ে রাখুন”।
নীল নম্বরটা নিয়ে নিল। ছেলেটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।
তুষারবাবু বাংলোয় ঢুকতে ঢুকতে বললেন “এই শীতে কি কোন কাজে এসেছেন স্যার? সাধারণত এই সময় তো কেউ আসে না”।
নীল বলল “না, আমি ছুটি কাটাতে এসছি, জানলা গুলো খুলবেন না?”
“বৃষ্টি নামবে স্যার এক্ষুণি, দেখছেন না কী কালো করে এসছে?”
নীল কিছু বলল না।
তুষারবাবু তার হাফ প্যান্টের পকেট থেকে টর্চ বের করে মোমবাতি খুঁজে সেগুলো জ্বাললেন। মোমের আলোয় নীল বুঝতে পারল ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্র সবই দামী কাঠের।
“আপনার লাঞ্চ কিন্তু রেডি স্যার। এখন খেয়ে নেবেন?”
নীল বলল “নাহ, ফ্রেশ হলাম না তো”!
তুষারবাবু বললেন “ঠিক ঠিক, আচ্ছা আমি গরমজল পাঠাচ্ছি। চলুন আপনার রুমটা দেখিয়ে দি”।
নীল তুষারবাবুর পিছন পিছন গেল। তুষারবাবু একটা মোমবাতি নিয়ে এসছিলেন। বেডরুমের দরজা খুলতেই পাওয়ার চলে এল।
তুষারবাবু উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন “আপনি খুব লাকি স্যার। এবার ভেবেছিলাম দুদিন লাগিয়ে দেবে”।
নীল বেডরুম দেখে খুশি হল। বিরাট ঘর। ঘরের সঙ্গে মানানসই চমৎকার খাট। সাদা ধবধবে চাদর পাতা। কম্বল পাতা পায়ের কাছে। নীলের বিছানাটা দেখেই ঘুম পেয়ে গেল।
তুষারবাবু তার স্যুটকেস আর কিট ব্যাগ এনে ঘরে ঢুকিয়ে বললেন “আপনি একটু বসুন স্যার, আমি গরম জল পাঠাচ্ছি”।
ঘরের ভিতরে বেশ ঠান্ডা লাগছিল। নীল ঠিক করল লাঞ্চ করেই কম্বলের ভিতর ঢুকে যাবে। তুষারবাবু হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। নীল বলল “আচ্ছা শুনুন”।
তুষারবাবু বললেন “হ্যাঁ স্যার”।
“বলছি এখানে ব্যাঙ্কটা কোনদিকে?”
“ব্যাঙ্কে যাবেন? আজ তো রবিবার”।
অবাক হয়ে বললেন তুষারবাবু।
নীল মাথা নাড়ল “না ব্যাঙ্কে কাজ নেই, একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে”।
তুষারবাবু বললেন “ওহ, ব্যাঙ্কের লোকের সঙ্গে?”
নীল বলল “হ্যাঁ। ব্যাঙ্ক কি কাছেই?”
তুষারবাবু বললেন “না, ব্যাঙ্কের জন্য আপনাকে বাজারে যেতে হবে স্যার। দূর আছে। আচ্ছা, দুপুরে খেয়েই বেরিয়ে যাবেন?”
নীল বলল “না না, বিকেলের দিকে বেরোতে পারি”।
তুষারবাবু বললেন “দুপুরে যাবেন? এখানে কিন্তু ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে যায়। চিনে ফিরতে পারবেন তো?”
নীল বলল “সে না হয় দেখা যাবে, বাজারে গাড়ি পাওয়া যাবে তো?”
তুষারবাবু বললেন “তা পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনি যার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, তিনি কোথায় থাকেন?

আজ ছুটির দিনে ব্যাঙ্কে গিয়ে তাকে পাবেন কী করে? একটা জিনিস হতে পারে, আপনি ওনাকে ফোন করে নিন বরং।"
নীল থমকাল কথাটা শুনে। তারপর বলল "আচ্ছা, আজ না হয় বাজারে হেঁটেই আসা যাবে"।
তুষারবাবু বললেন "ঠিক আছে। আচ্ছা, কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে স্যার,ওহ..." বলে থমকালেন তুষারবাবু, "দেখেছেন? আমি আবার গ্যাসে জল গরম করার কথা বলতে যাচ্ছিলাম, এখন তো পাওয়ার চলে এসছে। আপনি গীজার ব্যবহার করুন। আচ্ছা, আমি চালিয়ে দিচ্ছি"।
বেডরুম সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে গীজার চালিয়ে দিলেন তুষারবাবু। "মিনিট দশেক পরে গরম জল চলে আসবে স্যার। আচ্ছা দুপুরে মুরগীর ঝোল, আলুভাজা আর ভাত। অসুবিধা নেই তো?"
নীল হাসল "মুরগীতে আমার কোনদিনও অসুবিধা নেই"।
"তাহলে আমি লাঞ্চের ব্যবস্থা করি। আপনি ফ্রেশ হয়ে নিন স্যার"।
তুষারবাবু বেরিয়ে গেলেন।
নীল মোবাইলটা বের করল। হোয়াটস অ্যাপ খুলে একটা কন্ট্যাক্ট খুলে অনেকক্ষণ ডিপিটার দিকে তাকিয়ে বলল "ভাল আছ, তিতির?"

২

রান্না বেশ ভাল হয়েছিল। রান্নার লোক একজন নেপালি মহিলা। তিনিই সার্ভ করে দিলেন। তুষারবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন।
নীল বলল "আপনিও খেয়ে নিতে পারেন তো?"
তুষারবাবু অদ্ভুতভাবে হেসে বুঝিয়ে দিলেন এটা তিনি ভাবতেই পারেন না"।
নীল বলল "আপনারা ঝালটা একটু বেশি খান না?"
তুষারবাবু বললেন "বেশি হয়েছে ঝাল? এ বাবা, দেখেছেন"।
নীল বলল "না না, বেশি হয় নি। আমি ঝাল বেশিই খাই, ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আচ্ছা আপনাদের এখানে মোমো বানায় না?"
তুষারবাবু বললেন "হ্যাঁ, আজ বিকেলে তো মোমোই থাকছে স্যার"।
নীল বলল "বাহ। আপনি তো এরকম করলে আর কোথাও যাওয়া হবে না আমার। এত ভাল খাওয়াচ্ছেন"।
তুষারবাবু খুশি হলেন "থাকুন না স্যার যত খুশি, এই পোড়ো জায়গায় কেউ আসেই না"।
নীলের চোয়াল শক্ত হল "নাহ, থাকলে হবে না, একটা কাজ আছে, করেই চলে যাব"।
তুষারবাবু বুঝলেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।
খেয়ে দেয়ে ঘরে ফিরে নীল বুঝল তুমুল বৃষ্টি নেমেছে।
জানলার পর্দা সরাল। চারদিক ধুয়ে যাচ্ছে বৃষ্টিতে।
"আজ আর আপনার বেরনো হবে না স্যার"।
তুষারবাবু এসছেন। নীল বলল "তাই দেখছি, এখানে তো ভালই শীত পড়ে"।
তুষারবাবু বললেন "তা পড়ে। রাতের দিকে আরও পড়বে। পাহাড়ি এলাকা, শীত তো পড়বেই। আপনি কি এর মধ্যে চারদিকটা ঘুরবেন? একটা গাড়ি ঠিক করে দেব?"
নীল বলল "এক কাজ করুন, কালকে ব্রেকফাস্ট করে আমি বাজার যাব একটু। তখন গাড়ি ঠিক করে দিলেই হবে"।
তুষারবাবু বললেন "আচ্ছা স্যার। আপনি তবে রেস্ট নিন। আর পারলে মোবাইলটা চার্জে বসান। ভাবগতিক

সুবিধের ঠেকছে না। আবার কারেন্ট চলে যেতে পারে"।
নীল মাথা নাড়ল।
তুষারবাবু বললেন "আমি আসছি স্যার"।
নীল অবাক হল "আপনি এখানেই থাকেন না?"
তুষারবাবু বললেন "হ্যাঁ, পিছনে একটা ঘর আছে। তবে রান্না করার লোক বাইরে থেকে আসে। সব সময় তো আর গেস্ট আসেন না, সব সময় কী বলছি, খুব কম দিনই এখানে কেউ আসেন। কী করবে এসে এখানে? কিছু দেখার তো তেমন নেই। বেশিরভাগ চা বাগানও বন্ধের মুখে। সাহেব তো শুনছিলাম বাংলোটাও বেঁচে দিতে পারেন"।
নীল বলল "এই বাংলোয় ভূত আছে নাকি?"
তুষারবাবু হাসতে হাসতে বললেন "ও থাকলেই ভাল হত বোধহয়। কারও সঙ্গে কথা বলা যেত অন্তত"।
"আপনি কলকাতার?"
"হ্যাঁ। কলকাতা ঠিক না, আমার বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়"।
"বাংলো বিক্রি হয়ে গেলে কি করবেন?"
"যিনি কিনবেন তিনি আর কাকে পাবেন বলুন তো স্যার? কে থাকতে আসবে এখানে?"
"বাহ, আপনি তো বেশ কনফিডেন্ট"।
"কী করব স্যার? হাতে পায়ে ধরে থাকতে হবে। সাতচল্লিশ পেরোলাম। এই বয়সে আর কোথায় যাব? বিয়ে থা করিনি। একটা পেট। চলে যাবে কম মাইনে দিলেও"।
"বিয়ে থা করেন নি, কেন?"
"হাসালেন স্যার। নিজের পেটই চলে না আবার আরেকজনকে জুটাব?"
নীল আর কিছু বলল না।
তুষারবাবু বললেন "আচ্ছা, স্যার আপনি রেস্ট করুন"।
তুষারবাবু চলে গেলে নীল জানলার কাছে দাঁড়াল। তুমুল শীত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাইরে বৃষ্টির শব্দ। সে লাইট অফ করে দিল।
ঘরের মধ্যে অদ্ভুত এক আলো আঁধারি তৈরি হয়েছে।
খাটে বসল নীল। ফোনটা খাটেই ফেলে খেতে গেছিল। চার্জে বসানোর জন্য ব্যাগ থেকে চার্জার বের করে কী মনে হল, সে তিতিরকে ফোন করল। ফোনটা বেজে গেল। তিতির ধরল না।
নীল জানত ধরবে না। অন্য নম্বর থেকে ফোন করবে না সে কোনদিন।
ধরলে চেনা নম্বর থেকেই ধরুক নয়ত ধরতে হবে না।
ফোনটা চার্জে বসিয়ে চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করল নীল। সারারাত ট্রেনে এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারে নি। শরীরে ক্লান্তি আছে। যেদিন থেকে ঠিক করেছে, ব্যাপারটা করতে হবে, সেদিন থেকে রাতে ঘুম হচ্ছে না তার।
ওই মুখটা, যেটা তাকে ছেড়ে গেছে, সেই মুখটা যেন আর কারও না হয়।
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে হবে মুখটা।

দিন ২

পর্ব ৩

সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল তোরসার। সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। ঘুম ভেঙে বেশ খানিকক্ষণ বিছানাতেই শুয়ে থাকল সে। কলকাতায় থাকাকালীন এত শীতের কথা ভাবাই যেত না। কোন কোন দিন তো ফ্যানও চালাতে

হত!
ডিসেম্বর মাসে এখানে শীত যে কামড়টা দেয় তা শীতকাতুরেদের সহ্য হবার কথা নয়। তোরসা শীতকাতুরে নয়। সে শীতপ্রেমী। এই চাকরিটা এ ক'দিনেই সে ভালোবেসে ফেলেছে। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন চাকরি। আর এই পোস্টিংটা কলকাতা থেকে দূরে হয়ে সব থেকে ভাল হয়েছে। যদিও ব্যাঙ্কের চাকরি একটু গোলমেলে আছে, ক্যাশে বসতে প্রথম প্রথম একটু ভয় ভয় করত, তবু মাসের শেষে মাইনেটা ঢুকলে বেশ ভাল লাগে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে।
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ছ'টা দশ। তোরসা রোজের মতই সকাল সকাল স্নান, পুজো সেরে নিল। অভ্যাসবশত হোয়াটস অ্যাপ চেক করল। একগাদা মেসেজ বন্ধুদের গ্রুপের।
সেগুলো চেক করে রিপ্লাই দিতে দিতে আটটা বাজল। মাসী আসার সময় বাজার নিয়ে আসে। তোরসা বলল "তুমি আজ কী আনলে, মাছ না মাংস?"
মাসী রান্নাঘরে ব্যাগ নামিয়ে বলল "বাজার তো খোলে নি ভাল করে। আমি সব্জি নিয়ে এলাম শুধু। রাতে মাংস খেয়ো"।
তোরসা বলল "একটু দেরী করে আসতে কী হয় তোমার? নিরামিষ খেতে একদম ভাল লাগে না। তাছাড়া এই ওয়েদারে কোথায় একটু মাংস করবে"।
মাসী ফ্রিজ খুলে বলল "ডিম করে দিচ্ছি।ফ্রিজে ডিম আছে"।
তোরসা ঠোঁট ওলটাল, "আচ্ছা, তাই কর"।
মাসী রান্নাঘরে বসল আলু নিয়ে। বলল "তুমিও কিন্তু রান্না শিখতে পারো দিদি। যা শীত আর বৃষ্টি পড়ছে, কোনদিন আটকে পড়লে তো না খেয়ে থাকবে"!
তোরসা বলল "কেন? রান্না পারি তো। ম্যাগি"।
মাসী হেসে দিল "হ্যাঁ,তাও ঠিক ঠাক পারো না"।
তোরসা চোখ বড় বড় করে বলল "একদম মিথ্যা কথা বলবে না, তুমি কবে খেলে?"
মাসী বলল "কেন? সেদিন খাওয়ালে না বিকেলে? ঈশ, তোমার যে কী হবে শ্বশুরবাড়ি গেলে?"
তোরসা বলল "আমার কী হবে? রান্না করতেই হবে এটা কোথাও লেখা আছে নাকি? তাছাড়া আমি তো শর্ত দিয়েই দেব, ছেলেকে ভাল রান্না জানতে হবে"।
মাসী গজগজ করতে লাগল "ওই আশাতেই থাকো। ছেলেদের তো চেনো না। প্রথমে অনেক কিছু বলবে, এই করে দেব, সেই করে দেব, তারপরে দেখবে কচু পারবে। নিজে পারলেও বউকে দিয়েই করাতে হবে। বউ তো না, চাকর যেন। বাঙালি বল, গোর্খা বল, নেপালি বল, ভুটিয়া বল, আর বিহারি বল। সব সমান"।
তোরসা বুঝল এবার মাসীর গল্পের ঝাঁপি খোলার সময় এসে গেছে, সে আগ্রহী মুখ করে বলল "কেন কেন? কোন বাড়িতে আবার এই কেস হল?"
মাসী বলল "ওই যে তোমার বিশ্বাস বাড়ি। ছেলের একটু পায়ে সমস্যা আছে। সেদিন গিয়ে দেখি বউকে কী ঝাড়! কী, না অফিস থেকে ফেরার পর সে বাবু বউকে বলেছে পা টিপে দিতে, বউ বলেছে স্কুল থেকে ফিরে তারও শরীরটা ভাল ঠেকছে না। ব্যস, কেন বলেছে! কেন বউ পা টিপে দেয় নি। চ্যাঁচামেচি বাড়ির মধ্যে। বউটা ওদিকে কত ভাল টিচার। সবাই মান্যি গণ্যি করে"।
তোরসা বলল "বউটারই তো দোষ, অত কথা শোনার কী আছে? থাকুক তোমার সংসার বলে বেরিয়ে গেলেই হল"!
মাসী গালে হাত দিল, "একী অলুক্ষুণে কথা গো। অত সোজা নাকি সবকিছু"।
তোরসা বলল "আমি হলে তাই করতাম। সম্মান নিয়ে কোন কম্প্রোমাইজ করব না। যা পারো করে নাও"।
মাসি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল "ভাল করেছ তুমি বিয়ে কর নি। ঝামেলা হতই"।

তোরসা বলল "ঠিক হয়ে যাওয়া বিয়ে ভেঙেও তো দিলাম এজন্যই মাসী। যেখানে আমার সম্মান নেই, সেখানে আমি নেই"।
মাসী বলল "সে ছেলে তো তোমাকে ভালোবাসে?"
তোরসা বলল "যে ছেলে আমার সম্মান রাখতে পারে না, তাকে তো ভালোবাসা বলা যায় না মাসী"।
মাসীর সব্জি কাটা হয়ে গেছিল। উঠে গ্যাস চালিয়ে রান্না শুরু করতে করতে বলল "কী জানি, আমরা তো চিরটা কাল লাথি ঝাঁটা খেয়েই কাটিয়ে দিলাম। তোমার মত ভাবতে পারলে তো ভালই হত"।
তোরসা বলল "তুমি রান্না কর, আমি একটু ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াই"।
মাসী বলল "তা দাঁড়াও, আচ্ছা শোন, আজ কিন্তু রাতে আমার আসতে একটু দেরী হবে"।
তোরসা বলল "আবার কী হল? ডাক্তার দেখাতে যাবে নাকি?"
মাসী বলল "না, আরে আমার পাশের বাড়ির ওই নেপালী মেয়েটা, গুড়িয়া, ওর পা ভেঙে গেছে"।
তোরসা অবাক হয়ে বলল "তার সাথে তোমার আসা না আসার কী সম্পর্ক?"
মাসী বলল "ও তো ওই এস্টেটের বাংলোতে রান্না করে। এখন গেস্ট এসেছে। আমাকেই রান্নার জন্য ঠিক করে দিয়েছে এ ক'টাদিন!"
তোরসা বলল "গেস্ট হাউসে লোক এসছে? বল কী গো? এখানে কে এল?"
মাসী বলল "তার আমি কী জানি। আজ গেলে খবর পাওয়া যাবে"।
তোরসা বলল "আচ্ছা। যাও। আর শোন, বিকেলে যদি নিরামিষ খাইয়েছ তাহলে তোমাকে বাথরুমে আটকে রেখে দেব বলে দিলাম, হ্যাঁ!"

পর্ব ৪

আদৃতার স্কুটি যখন তোরসার বাড়ির সামনে এল তখন তোরসা তালা লাগাচ্ছিল।
তোরসা স্কুটিতে ওঠার আগে বলল "ঈশ তোকে কী গোলু গোলু লাগছে"।
আদৃতা বলল "কী করব বল, ভেবেছিলাম একটু ডায়েটিং করব, মা কালকে পেস্ট্রি নিয়ে এসছিল, সামলাতে পারলাম না নিজেকে"।
তোরসা হি হি করে হেসে বলল "আর সামলে কাজ নেই। সাবধানে চালা আজকে, রাস্তায় স্কিড করতে পারে, আর কথা বলিস না"।
আদৃতা শুনল না। বক বক করতে করতে সারা রাস্তা গেল।
ব্যাঙ্কে পৌঁছে বায়োমেট্রিক পাঞ্চ সেরে আদৃতা বলল "আজকে মনে হয় তোকে ক্যাশে বসতে হবে"।
তোরসা মুখ ব্যাকাল "কেন আজ বিজনদা আসে নি?"
আদৃতা বলল "কালকেই শুনছিলাম আসবেন না"।
তোরসা বলল "দেখি,দ্য গ্রেট ডিক্টেটর কী বলে!"
আদৃতা বলল "এক গাদা অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্ম আছে। আমার আজ মাথা খারাপ হবে"।
তোরসা বলল "তাও ভাল, আমার মত সারাদিন হাতের কাজ করে যেতে হবে না, উফ কী কুক্ষণে যে ব্যাঙ্কের চাকরি করলাম"।
আদৃতা বলল "শোন না, আজ পেস্ট্রি এনেছি টিফিনে। খাবি তো?"
তোরসা চোখ বড় বড় করে বলল "খাব না মানে, পেস্ট্রি আমি খাব না, হতে পারে কোনদিন?"
আদৃতা বলল "ওই দেখ, এসে গেছে তোর ডিক্টেটর"।
ব্যাঙ্ক খুলে গেছিল। ধীরে ধীরে লোক আসা শুরু হয়েছে। ভিড় কম নয়।

তোরসা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাজে লেগে গেল। এই সময়টা ফোনটা সাইলেন্ট করে রাখে সে। ফোন এলে ধরে না। বাড়িতে বলা আছে, ব্যাঙ্কিং আওয়ারসে খুব বিরাট কিছু না হলে কেউ ফোন করবে না।
একজনকে কম্পিউটারে এন্ট্রি করে টাকাটা দিতে যাবে এই সময় সেই পরিচিত মুখটাকে দেখতে পেল তোরসা। কাউন্টারে এসে দাঁড়িয়েছে।
সে প্রথমেই মাথা নিচু করল। তারপর বুঝল ব্যাপারটা বোকা বোকা হয়ে যাচ্ছে।
মাথা তুলে তার চোখে চোখ রেখে বলল "বলুন"।
সে বলল "একটু কথা বলা যাবে?"
তোরসা বলল "কী ব্যাপারে বলুন? অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে চান? সাত নম্বরে চলে যান"।
সে টোকেনটা তার টেবিলে দিয়ে বলল বলল "না, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি"।
তোরসা একই রকম যান্ত্রিক ভাবে বলল "কাজ না থাকলে ভিড় করবেন না প্লিজ। ব্যাঙ্কিং আওয়ারসে অনেক কাজ থাকে"।
সে কাউন্টারের সামনে থেকে সরে চুপচাপ চেয়ারে গিয়ে বসল।
পরের জন চলে এসছিল। তোরসার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছিল। তবু সে নিজেকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।
আবার কেন সে ফিরে এসেছে?
তোরসা আর তার দিকে তাকাল না। একমনে কাউন্টার সামলে যেতে লাগল। একবার মনে হল সিকিউরিটিকে ডাকবে, পরক্ষণে বহু কষ্টে নিজেকে সামলাল।
আদৃতার দিকে তাকাল একবার। আদৃতা চোখ বড় বড় করে ইশারায় জানতে চাইল ছেলেটা কে। তোরসা চোখ ফিরিয়ে নিল।
লাঞ্চ আওয়ার হয়ে এসছিল। সে কাউন্টার থেকে উঠতে যেতেই সে চলে এল "এবার কথা বলা যাবে"?
তোরসা বলল "অফিসের মধ্যে অফিসিয়াল কাজ ছাড়া কোন কথা বলা যাবে না"।
সে বলল "অফিস আওয়ারসের পরে কথা বলা যাবে? বা এখন তো লাঞ্চ আওয়ারস। একসাথে লাঞ্চ করা যেতে পারে"।
তোরসা বলল "আমার টিফিন আছে। থ্যাঙ্কস"। আর তাকে কথা বলার সুযোগ দিল না তোরসা। কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে রেস্টরুমে চলে গেল।
আদৃতা তাকে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ল, "উফ, ছেলেটা কী হ্যান্ডু রে, কী বলছে তোকে?"
তোরসা গম্ভীর হয়ে বলল "খেয়ে নি"।
আদৃতা অভিমানী সুরে বলল "বলবি না?"
তোরসা আদৃতার চোখে চোখ রেখে বলল "ইনি আমার এক্স। আমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসছেন। বুঝেছেন?"
আদৃতা তোরসার হাত ধরে বলল "উফ, এত হ্যান্ডু। এর সঙ্গে কেউ ব্রেক আপ করে?"
তোরসা বলল "যেটা জানিস না, সেটা নিয়ে কিছু না বললেই ভাল বোধ হয়"।
আদৃতা বলল "থাক। বলতে না চাইলে বলতে হবে না। শোন না, আমাকে দিবি?"
তোরসা অবাক হয়ে বলল "কী দেব?"
আদৃতা বলল "তোর এক্সকে?"
তোরসা হেসে ফেলল, পাগলীটা এমনই। বলল "নিয়ে নে। নিয়ে আমাকে বাঁচা"।
আদৃতা বলল "হুহ, আমাকে যেন কত দেখবে। তোর মত সুন্দরীকে ছেড়ে কেউ আসবে আমার কাছে?"
তোরসা আদৃতার থুতনি নেড়ে দিয়ে বলল "আসবে মানে? দৌড়ে দৌড়ে আসবে"।

আদৃতা বলল "বল না বল না, তোর স্টোরি টা। এদ্দিন পুরো চেপে ছিলিস, হ্যাঁ?"

পর্ব ৫

"স্যার দুপুরে তো কিছু খেলেন না, এখন কি কিছু খাবেন?"
ঘুম ভাঙ্গালেন তুষারবাবু। নীল দেখল তুষারবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।
সে দরজাটা খুলেই ঘুমিয়েছিল।
বলল "খেতে ইচ্ছা করছে না কিছু"।
তুষারবাবু বললেন "সে কথা বললে হবে? সাহেব জানলে তো রাগারাগি করবেন"।
নীল বলল "বলার দরকার নেই কিছু"।
তুষারবাবু ইতস্তত করে বললেন "বাজার যাওয়ার আগে তো বললেন ডিম ভাত খাবেন, রান্নাও করানো হল। খাবারটা নষ্ট হয়ে যাবে স্যার"।
নীল বলল "নষ্ট হবে কেন? রাতে খেয়ে নেব"।
তুষারবাবু বললেন "এখন কিছু আর রান্না করাব না? রাঁধুনির সঙ্গে একটু কথা বলে নিন স্যার। কাল কী খাবেন"।
নীল বিরক্ত হল। লোকটা তো ঘ্যান ঘ্যান করেই যাচ্ছে। বলল "আপনি বলে দিন না"।
তুষারবাবু বললেন "আমি কী করে বলি বলুন তো?"
নীল বলল "আমাকে কি তবে আবার উঠে ডাইনিং রুমে যেতে হবে?"
তুষারবাবু বললেন "এখানে ডাকব?"
নীল কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল "ডাকুন"।
তুষারবাবু বেরলেন। নীল উঠে বসল। আগে জানলে এই বাংলোতে উঠত না। এই লোকটা এত কেয়ার নিলে তো সমস্যা!
রাধুনি মহিলাকে নিয়ে তুষারবাবু তার ঘরে ঢুকলেন। নীল অবাক হল "কী হল? ইনি?"
তুষারবাবু দাঁত বের করলেন "আর বলবেন না স্যার, ওই মেয়েটা পা ভেঙেছে"।
নীল বলল "সেকি"!
তুষারবাবু বললেন "হ্যাঁ, এখান থেকে বেরিয়েই। যাই হোক, এও গেস্ট হাউসেই রান্না করত এক সময়। আপনি ওকে বলে দিলে হবে"।
মাসী বলল "সকালে কী খাবেন?"
নীলের নিজেকে কেমন দেশের রাস্ট্রপতি বলে মনে হচ্ছিল। সে বলল "যেটা খুশি করুন না। কোন অসুবিধা নেই"।
মাসী একটু অবাক হয়ে তুষারবাবুর দিকে তাকাল, বুঝতে পারল না কী করবে। তারপর বলল "পরোটা তরকারি খাবেন?"
নীল বলল "হ্যাঁ। তাই করুন"।
"আর দুপুরে?"
তুষারবাবু নীল বলার আগেই বললেন "দুপুরে মাংসই কর। কী স্যার ঠিক আছে না?"
নীল বলল "আচ্ছা। তাই হোক"।
তুষারবাবু বললেন "এখন কিছুই খাবেন না?"
নীল বলল "এখন ক'টা বাজে?"

তুষারবাবু ঘড়ি দেখলেন "পৌনে সাতটা"।
নীল বলল "আমি এখন একবারে ডিনার খেয়ে নি"।
তুষারবাবু অবাক হয়ে বললেন "এখনই খেয়ে নেবেন?"
নীল বলল "হ্যাঁ, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি"।
তুষারবাবু বললেন "তাহলে কি ভাত বাড়তে বলব?"
নীল বলল "হ্যাঁ ভাত বাড়ুন, আমি মুখ ধুয়ে আসছি"।
মাসী অবাক চোখে নীলকে দেখতে দেখতে ঘর থেকে বেরোল।
নীল চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ।
তুষারবাবু ডাক পাড়লেন "স্যার, খেতে আসুন, খাবার বেড়েছে"।
নীল উঠল। এ লোকটা না খেলে মাথা খারাপ করে রেখে দেবে।
মুখ ধুয়ে খেতে বসল। মুসুরির ডাল, আলুভাজা, আর লাল লাল ডিমের ঝোল।
নীল সব একসাথে মেখে ফেলল।
মাসী অবাক হয়ে বলল "এ আবার কেমন খাওয়া"!
নীল বলল "আমি এভাবেই খাই"।
মাসী আর কিছু বলল না। জাঁকিয়ে শীত পড়ছে। গরম গরম ভাত খারাপ লাগছিল না খেতে।
খেতে খেতে নীল বুঝতে পারছিল ভাল খিদে পেয়েছিল আসলে।
মাসী বলল "রাতে খিদে পেলে কী করবেন? কিছু করে রাখব?"
নীল বলল "খিদে পাবে না আর, এই তো খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ব আবার"।
তুষারবাবু বললেন "স্যার আপনার কাজ হয়েছে আজকে?"
নীল খেতে খেতে থমকাল "হ্যাঁ, ওই আর কী, কাল আরেকবার যেতে হবে"।
তুষারবাবু বললেন "কাল কিন্তু দুপুরে খাবেন স্যার। এভাবে খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম করলে পাহাড়ে যদি শরীর খারাপ বাধান তাহলে মহা সমস্যা হয়ে যাবে"।
নীল বলল "না না, কী আর হবে, আমার অভ্যাস আছে এভাবে খাওয়ার"।
তুষারবাবু বললেন "একটা প্রশ্ন করব?"
নীল বলল "খেয়ে নি। তারপর যত পারেন করুন"।
তুষারবাবু তার বিখ্যাত দাঁত আবার বের করলেন "এহ হে, ঠিক ঠিক। আচ্ছা স্যার। আপনি খেয়ে নিন। তারপরে জিজ্ঞেস করব"।
নীল বিরক্ত মুখে ভাতটা শেষ করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। দরজা খোলা থাকলেই লোকটা ভাইভা শুরু করে দিচ্ছে।
টিভি আছে এ ঘরে একটা। সে টিভি চালাল। বেশ কয়েকবার এ চ্যানেল সে চ্যানেল করে বিরক্ত হয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিল।
তারপর বিড়বিড় করতে লাগল "কথা না বলা বের করছি তোমার"।

পর্ব ৬

"উফ দিদি, গেস্ট হাউসে একটা পাগল ছেলে এসে উঠেছে"।
দরজা খুলতেই মাসীর প্রথম কথা।
তোরসা বলল "তাই? কেন বলত?"

মাসী বলল “আর বল কেন? বাজারে না কোথায় গেছিল, সেখান থেকে ফিরেছে তিনটের সময়। তারপর তেজ দেখিয়ে খায় নি। এখন দেখি পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে”।
তোরসার একটা হার্টবিট মিস হল। মুখে আগ্রহ দেখাল না। বলল “তুমি কি আমাকে নিরামিষ খাওয়াবে আজকেও?”
মাসী রান্নাঘরে ঢুকে বলল “উফ, না গো, মাংস করছি রাত্তিরে। তোমায় চিন্তা করতে হবে না। আচ্ছা তারপর যেটা বলছিলাম, ওই কেয়ারটেকারবাবু তো ওনাকে ডেকে তুললেন। উঠে কী বলে জানো?”
তোরসা উত্তর দিল না।
মাসী বলে যেতে লাগল “বলে আমি এখন খেয়ে নেব। তারপর খাওয়া শোন”।
তোরসা বিরক্ত মুখে বলল “আহ মাসী। কোন লোক কী খেয়েছে তার বৃত্তান্ত আমাকে কেন শোনাচ্ছ। রান্না কর তো! আমার কাজ আছে”।
মাসী অবাক হল, তোরসা কখনও এভাবে তার সঙ্গে কথা বলে না। বলল “তোমার আবার কী হল?”
তোরসা বলল “অন্য লোকের কথা আমাকে বলছ কেন?”
মাসী গালে হাত দিল “ওমা! অন্য লোকের কথা তুমি যেন শোন না?”
তোরসা কিছু বলল না। মাসী বলল “ডাল ভাত আলুভাজা ডিমের ঝোল সব একসাথে মেখে খাওয়া শুরু করল। কী পাগল রে বাবা!”
তোরসা আনমনে বলল “দুপুরে খায় নি?”
তারপরেই বুঝে গেল ভুল করে ফেলেছে, তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করতে গেল “মানে তোমার রান্না খেল না? তুমি এত কষ্ট করে রেঁধেছিলে?”
মাসী জিতে যাওয়ার হাসি হাসল “তবে? এই যে বলেছিলে বলবে না?”
তোরসা রেগে গেল “বললে বল, নাহলে বাদ দাও”।
মাসী বলল “না না বললাম যখন শুনেই নাও। দুপুরে কিচ্ছু খায় নি। আমি তো দাঁড়িয়েছি ভাত বাড়ব বলে। সে কী তেজ! কেয়ারটেকারবাবু জিজ্ঞেস করলেন স্যার খাবেন না? কী রেগে গেলেন, বলে আপনাদের কি খাওয়া ছাড়া আর কোন কথা নেই! তারপর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। আমাকে দেখতেও পেল না যেন। সেই লোকই ঘুম থেকে উঠে চেঞ্জ। আগের মাসির কথা শুনে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে। পুরো পাগল”।
মাসী হাসতে লাগল।
তোরসা মাসীর সামনে টুল নিয়ে বসে গল্প করে রোজ। আজ আর বসে থাকল না।
উঠে ঘরে চলে এল। মাসী ডাকল “কী হল আবার?”
তোরসা বলল “কাজ আছে একটু। তুমি রান্না হয়ে গেলে ডেকো”।
মাসী বলল “কী যে হল তোমার”।
তোরসা কান দিল না।
ঘরে এসে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল।
আবার কেন ফিরে এল ও?
তাকে খুঁজেই বা পেল কী করে? তার বন্ধুদের মধ্যেই কি কেউ? সবাইকে তো বলাও হয় নি। এমনিতেই যতবার সিম চেঞ্জ করেছে, ততবার কোথাও না কোথাও থেকে নাম্বার জোগাড় করে ফোন করেছে। সে ধরে নি। তবু বার বার ফোন করে গেছে। মেসেজ করে গেছে। কখনও নরম স্বরে, কখনও রাগী স্বরে বলেছে, “ফিরে এস”।
তোরসা ঠোঁট কামড়াল।

কালকে নিশ্চয়ই আবার ব্যাঙ্কে যাবে। চুপচাপ বসে থাকবে আজকের মতই। কথা বলতে আসবে। রোজ রোজ ব্যাপারটা ঘটলে কলিগরাই বা কী ভাববে তাকে? বিচ্ছিরি সীন ক্রিয়েট হবে।
ছুটি নিয়ে নেবে?
পরক্ষণেই মনে হল কতদিন ছুটি নেবে? নতুন চাকরি। বেশিদিন তো ছুটি নিয়ে ঘরে বসে থাকতেও পারবে না।
ফোনটা বেজে উঠল। আবার ফোন করেছে।
কয়েকবার রিং হয়ে চুপ করে গেল।
রোজ এভাবেই চলছে।
তোরসা ফোনটা হাতে নিল।
নম্বরটায় ডায়াল করেই তাড়াতাড়ি কেটে দিল।
আরেকটু হলেই রিং হত। ফোনটা খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলল সে। নাহ। মাসীর সামনেই বসতে হবে। এখানে একা একা থাকলেই আবার ফোন করতে ইচ্ছা করবে।
সে উঠে চুপচাপ রান্নাঘরে টুলে গিয়ে বসল। মাংস বসিয়েছে মাসী। বলল "কালকে সকালে পরোটা খাবে?"
তোরসা বলল "ঠিক আছে। কোর"।
মাসী বলল "ওই ছেলেটাও কাল পরোটা খাবে বলেছে। বাবা! প্রথমে তো বলতেই চাইছিল না কী খাবে"।
তোরসা বলল "ওহ, শোন শোন, কাল পরোটা খাব না। কালকে আমি ভাত খাব"।
মাসী বলল "তোমার কী হয়েছে বলত? থেকে থেকে কেমন পাগল পাগল ভাব করছ? কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?আগের মাসে বললে খুব পেট ব্যথা করছে। এবারেও সেরকম কিছু?"
তোরসা বলল "না না। তুমি এক কাজ কর তো। ওই বসু বাড়ির গল্পটা বল। ওই বাচ্চাটা কী বলছিল যেন?"
মাসী উৎসাহিত হয়ে অন্য গল্প করা শুরু করল।
তোরসা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পর্ব ৭

একবার ঘুম ভাঙার সমস্যা হল দ্বিতীয়বার ঘুম আসাটা অতটা সহজ হয় না। আগের রাতে পথের ক্লান্তিতেই ঘুম চলে এসছিল, আজ দুপুরে এসে ঘুমানোর পরে আর ঘুম আসছিল না।
বেশ কয়েকবার তিতিরকে ফোন করেছিল সে। ফোন তোলে নি।
তারপর ফোন অফ করে রাত ন'টায় শুয়ে পড়েছিল।
শেষ মেষ সাড়ে দশটা নাগাদ উঠে পড়ল।
আলো জ্বালল।
ব্যাগ থেকে আরেকটা ফোন বের করল। যেদিন ট্রেনে উঠেছে সেদিন থেকে ফোনটা সুইচ অফ করে রেখে দিয়েছিল।
ফোনটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল নীল। একটু ভেবে সেটা সুইচ অন করল। ব্যাটারি কম দেখাচ্ছে। যে কোন সময় অফ হয়ে যাবে।
একের পর এক এস এম এস পাঠিয়েছে শ্রমণা।
নীল বেশ কিছুক্ষণ সেগুলো দেখল।
ফোনটা আবার অফ করতে যাবে এই সময় বেজে উঠল।
শ্রমণা।
নীল প্রথমে ভাবল ধরবে না। কিন্তু অসাবধানে ফোনটা কাটতে গিয়ে রিসিভ করে ফেলল। অগত্যা কানে

দিল ফোনটা, ওপাশ থেকে শ্রমণার গলা "হ্যালো, হ্যালো, নীল"।
"বল"। শান্ত গলায় বলল নীল।
"তুমি কোথায় এখন?"
"কেন?"
"তোমাকে ফোন করে যাচ্ছি, ফোন অফ, হোয়াটস অ্যাপ করছি মেসেজ সীন হচ্ছে না, আন্টিকেও ফোন করতে সাহস হচ্ছে না যদি টেনশন করেন, তুমি সত্যি বলত কোথায়?"
নীল একটু থমকে বলল "আমি একটু নর্থ বেঙ্গলে এসছি"।
ওপাশে একটু নীরবতা। তারপর বলল "নর্থ বেঙ্গল? কেন? তোরসার খোঁজ পেয়েছ?"
নীল বলল "হ্যাঁ"।
"বাহ, তাহলে তো এখন রি ইউনিয়নের পালা। যাও, আমি আর ডিস্টার্ব করব না। গিয়ে জড়িয়ে ধর তোমার এক্সকে"।
নীল শান্ত গলায় বলল "জড়িয়ে ধরতে তো আসি নি"।
"তবে?"
"আমি ওর মুখটা পুড়িয়ে দিতে এসেছি। যাতে কোন শুয়োরের বাচ্চা ওর ইনোসেন্ট মুখ দেখে ওকে পছন্দ না করতে পারে"।
"হোয়াট! আর ইউ ক্রেজি নীল? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এসব কী বলছ? তুমি কোথায় আছ এখন? একজ্যাক্ট কোন লোকেশনে?"
"বলব না"।
"নীল শোন, তুমি বড় সড় ফেঁসে যাবে। ইউ রেপড দ্যাট বিচ, ও কিচ্ছু বলে নি, কোথাও যায় নি। চুপচাপ পালিয়ে গেছে ট্রান্সফার নিয়ে। এবার আর কিছু পাগলামি কোর না যাতে বড় কোন প্রবলেম হয়"।
"আই শ্যাল টক টু ইউ লেটার"।
"শোন শোন নীল, প্লিজ শোন, ইউ লাভ মি, ইউ লাভ মি না বেবি?"
"অফকোর্স আই লাভ ইউ, আর কাকে ভালবাসব? সেই মেয়েটাকে যে আমায় লাথি মেরে চলে গেল?"
"তবে? বোঝ, প্লিজ শোন, ওকে যা ইচ্ছা করতে দাও, নিজের মত থাকতে দাও। কেন শুধু জড়াচ্ছ বল তো?"
নীল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ফোনটা অফ হয়ে গেল। সে খানিকক্ষণ ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ব্যাগে রেখে দিল।
মাথাটা গরম হয়ে গেছিল এই শীতেও। সে ওয়াশরুমে গেল। বেসিনে গিয়ে দাঁড়াল। হীমশীতল জল বেরোচ্ছে কল থেকে। গীজার চালাল না সে। ওই বরফ ঠান্ডা জলই মাথায় দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। চোখ লাল হয়ে গেছে।
ফোন ধরবে না কেন ও? কেন ধরবে না?
ভীষণ রাগ হচ্ছিল তার। টাওয়েল মাথায় দিয়ে বেরিয়ে খাটে এসে বসল সে। অন্য ফোনটা অন করে তিতিরের ফোন আবার ট্রাই করতে লাগল।
ফোন একবার রিং হয়েই বিজি বলল।
"ব্লক করে দিয়েছ? ব্লক করে দিয়েছ?"
বলে ব্যাগ থেকে ফোনের পিনটা বের করল সে। সিম চেঞ্জ করে আবার ফোন করা শুরু করল তিতিরের নম্বরে। দুবার রিং হয়ে গেল, ফোন ধরল না। তিন বারের বার করতে গিয়ে বুঝতে পারল ফোন অফ করে দিয়েছে। রেগেমেগে ফোনটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারল নীল।

তারপর ব্যাগ হাতড়াতে শুরু করল। বেশ খানিকক্ষণ পরে ঘুমের ওষুধের স্ট্রিপটা খুঁজে পেল। দুটো ওষুধ বের করে খেয়ে নিল।
আয়নার দিকে তাকাল নীল। নিজেকে চিনতে পারছিল না...

পর্ব আট
দিন -৩

অনেকক্ষণ ছটফট করে রাত দুটোয় ঘুমোতে পেরেছিল তোরসা। ঘুম ভেঙে গেল সকাল ছ'টাতেই। জানলা খুলতেই নির্মেঘ নীল আকাশ উঁকি মারল। গত কয়েকদিন আকাশজুড়ে মেঘ ছিল। এখন একদম পরিষ্কার। তোরসা খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।
স্নান করল, পুজো করল মন দিয়ে।
নতজানু হয়ে বেশ খানিকক্ষণ ঈশ্বরের সামনে বসে রইল।
রোজই বসে, আজ একটু বেশি সময় ধরে বসল।
সমর্পণ শেষে ফোন অন করে বাড়িতে ফোন করল। সব খোঁজ খবর নিয়ে ফোনটা রাখল যখন, তখন সাড়ে সাতটা বাজে।
বাড়ির সামনের ছোট জায়গাটায় কয়েকটা নেপালি বাচ্চা ফুটবল খেলছে। তোরসা দেখছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল একটু খেলে পরক্ষণে নিজেকে সামলাল। বাচ্চাগুলো খুব বিচ্ছু। একবার ভাব করে নিয়ে তার ঘরে আসলে সব দফা রফা সেরে রেখে দেবে।
মাসী গজগজ করতে করতে এল। তোরসা অবাক হল "কী হল? গজগজ করছ কেন?"
মাসী বলল "আর বোল না,কালকে পরোটা ঠিক হয়েছিল, একটু আগে কেয়ারটেকারবাবু খবর দিল এখন আবার ছেলে বলছে সকালে একবারে ভাত খেয়েই বেরোবে। আমার ময়দা কেনা হয়ে গিয়েছিল কাল। ও যাই বলুক, টাকা আমি নিয়ে ছাড়ব ওর থেকে"।
তোরসা বলল "ও"।
মাসী রান্নাঘরে ঢুকল "এইজন্য আমি বাংলোতে রান্না ছেড়ে দিয়েছিলাম জানো, কলকাতা থেকে সব বড়লোক সাহেবরা আসে, তাদের একটারও মাথার ঠিক থাকে না। একবার এক সাহেব এসছিল, সে আবার এর চেয়েও আরও তিন কাঠি উপরে। নিজেই বলবে এই এই রান্না কর, তারপর খেতে বসলেই শুরু করে দেবে আবদার, একটু পাপড় ভাজো তো, বা একটা ডিম ভেজে দাও তো। খুব বাজে এগুলো। ক'টা টাকার জন্য এরা একেবারে কুকুর ছাগল ভাবে আমাদের"।
তোরসা বলল "কর কেন, না করলেই তো পার। কী এমন দেয়?"
মাসী বলল "করতাম নাকি? গুড়িয়ার জন্য করলাম। ওই মেয়েটার বর তো সারাদিন মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে। যে কটা টাকা পাব, ওকেই তার থেকে কিছুটা আলাদা করে দিয়ে দেব। সংসারটা ভেসে যাচ্ছে গো দিদি"।
তোরসা বলল "ওর বর খুব মদ খায়?"
মাসী ঘাড় নাড়ল "খায় মানে? আর কী করে না? মদ খায়, জুয়া খেলে, ঝামেলা করে, সব কিছুতে আছে"।
তোরসা বলল "কাজ বাজ কিছু করে না?"
মাসী বলল "কাজ বাজ? তাহলেই হয়েছে। বউয়ের পয়সায় খায়, আর রাতে মদ খেয়ে এসে সেই বউকেই পিটায়। তবে এখন গুড়িয়াও ছেড়ে কথা বলে না। ওকে তেড়ে আসলে ওও তেড়ে যায়। পড়ে পড়ে আর কতদিন মার খাবে?"

তোরসা বিড় বিড় করে বলল “পড়ে পড়ে মার খেয়েই তো এই অবস্থা হয়”।
মাসী বলল “কী বলছ তুমি?”
তোরসা সামলে নিল “কিছু না। তুমি আজ কী রাঁধছ?”
মাসী বলল “চালানি রুই”।
তোরসা মুখ ব্যাকাল “কেন? ছোট মাছ পাওয়া গেল না?”
মাসী বলল “বেশি ছিল না। ভেবেছিলাম নেব”।
তোরসা বলল “তাহলে নিলে না কেন?”
মাসী বলল “মনে হল তুমি যদি না খাও”।
তোরসা বলল “চালানি রুইয়ের থেকে ছোটমাছই ভাল। পরের দিন পেলে ওই এনো। আর আমার জন্য এক পিস ভাজা রেখো”।
মাসী ঘাড় নাড়ল।
#
আদৃতা স্কুটিতে উঠতেই বলল “আজকেও নিশ্চয়ই আমাদের হ্যান্ডু হিরো আসবে?”
তোরসা বলল “তোর আর কোন টপিক নেই? আর রাস্তায় ঠিক করে চালা। এটা তোর কলকাতার সমতল না”।
আদৃতা বলল “তা বটে। কিন্তু আজ যদি আসে, তাহলে তুই ছুটি নিয়ে নিস, দুজনে মিলে একটা রোম্যান্টিক দিন কাটাস”।
তোরসা বিরক্ত মুখে বসে থাকল। কোন কথা বলল না।
ব্যাঙ্কে পৌঁছে দেখল বিজনদা এসে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ক্যাশে বসলে এমনিতেই খুব চাপ থাকে। তার ওপর সে আসার ফলে ব্যাপারটা গতকাল খুব পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল।
তোরসা তৈরীই ছিল যে কোন সময় নীল আসবে বলে। অ্যাকাউন্ট ওপেনিংয়ের কাজ করছিল আর কেউ এলেই তার চোখ চলে যাচ্ছিল দরজার দিকে।
আদৃতা পর্যন্ত একবার ফিসফিস করে বলে গেল “আজ এলে একটু পরিচয় করিয়ে দিস না। তোকে নিজের হাতে মোমো বানিয়ে খাওয়াব”।
তোরসা পাত্তা দিল না।
এখানকার সমস্যা হল বেশিরভাগ লোকজনই সোজা কথা সোজাভাবে বুঝতে পারে না। লোকজনকে বোঝাতে কাল ঘাম ছুটে যায়। পাব্লিক ডিলিং করতে অবস্থা খারাপ হচ্ছিল রোজের মতই।
একটা সময় টিফিন টাইম হল।
তোরসা উঠল। রেস্টরুমে গেল। আদৃতা টিফিন খুলে বসেছে। তাকে বলল “কী রে, আমি তো ভেবেছিলাম আজকেও আসবে”।
তোরসা বলল “আমাকে প্লিজ বারবার এই নিয়ে খোঁচা দিস না। বিশ্বাস কর, আমি ঠিক নিতে পারছি না”।
আদৃতা বলল “তোকে নিতে কে বলল? তুই আমাকে দিয়ে দে না”।
তোরসা একটু থমকে বলল “ওর স্টেডি গার্লফ্রেন্ড আছে তো। তুই এত চাপ নিচ্ছিস কেন?”
আদৃতা হিহি করে হেসে বলল “কে সেই স্টেডি গার্লফ্রেন্ড? নিশ্চয়ই তুই?”
তোরসা বলল “না। আমি কেন হতে যাব”।
আদৃতা বড় বড় চোখ করে বলল “সেকী! স্টেডি গার্লফ্রেন্ড আছে তবু তোর পিছন পিছন ছুটছে কেন?”
তোরসা বলল “শুধু তাই না, মামণি ওর মায়েরই পছন্দ করে দেওয়া”।
আদৃতা চারদিকে চোখ বুলিয়ে তার কানে কানে বলল “তাহলে তো আলুর দোষ আছে বলতে হবে।

গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব? তুই ঠিকই করেছিস, একদম পাত্তা দিস নি। আমি হলে তো জুতো পেটা করতাম। চন্দনদাকে বলে রাখব?"
চন্দনদা সিকিউরিটি গার্ড। তোরসা মাথা নাড়ল "নাহ, কিচ্ছু বলতে হবে না। আমি শুধু ওকে আর আমার লাইফে একটুও স্পেস দিতে চাই না, দ্যাটস ইট"।
আদৃতা বলল "আজ এল না কেন বলত?"
তোরসা হাসল "অন্য কোন প্ল্যান করছে হয়ত। মেবি অ্যাসিড ছুঁড়বে। প্রায়ই তো ভয় দেখাত"।
আদৃতা শিউরে উঠে বলল "সেকী! তুই এত নির্লিপ্ত ভাবে কথাটা বলছিস কী করে?"
তোরসা বলল "আমার আর কিছু যায় আসে না রে। যা পারে করুক। আমি আর ওকে নিয়ে একটুও ভাবছি না"।

পর্ব নয়
দিন -৩

নীল দশটায় উঠে খাবার টেবিলে এল। তুষারবাবু সেখানেই ছিলেন।
তাকে দেখে বললেন "এই তো স্যার, ফ্রেশ হয়ে নিয়েছেন?"
নীল বলল "হ্যাঁ। খেতে দিতে বলুন"।
খাবার টেবিলে ছিল। মাসী প্লেটে ভাত বাড়তে লাগল।
নীল বলল "পরোটা হবার কথা ছিল না?"
তুষারবাবু অবাক হয়ে বললেন "সকালে তো একবার ঘুম ভেঙে এসে আপনি ভাতের কথা বলে গেলেন"।
মাসী অবাক হয়ে নীলের দিকে তাকিয়ে ছিল।
নীল বলল "ওহ, ভাত বলেছি না? আচ্ছা, শুনুন, আমি একটু অপেক্ষা করছি, পরোটাই বানাক মাসী। ভাত খেতে ইচ্ছা করছে না এখন"।
তুষারবাবু ভয়ে ভয়ে একবার মাসীর দিকে তাকালেন। মাসীর মুখ থমথমে। ঝড়ের পূর্বাভাষ পেলেন তুষারবাবু। বললেন "স্যার, রান্না তো হয়ে গেছে। এখন আবার..."
নীল উঠল। "অসুবিধা থাকলে ছেড়ে দিন। আমি রাস্তায় খেয়ে নেব"।
বলে বেডরুমে চলে গেল।
স্নানে ঢুকল। গীজার চালালো না আর। হীমশীতল জলেই কাঁপতে কাঁপতে স্নান সেরে নিল। বেরিয়ে জামা কাপড় পরছিল, তুষারবাবু এসে দাঁড়ালেন।
"স্যার"।
"বলুন"।
"পরোটা হচ্ছে। খেয়ে বেরোবেন"।
"দেরী হবে?"
"কত আর দেরী হবে, আধঘন্টা খুব বেশি"।
"আধঘণ্টা? ছেড়ে দিন। আমি বাইরে খেয়ে নেব"।
"মাসী তো রান্না শুরু করে দিয়েছে"।

"ভাল তো। আপনারা খেয়ে নেবেন"।
"হে হে, কী বলছেন স্যার। এ আবার হয় নাকি?"
"কেন হয় না, আপনি খান না? কী খান আপনি?"
"খাই স্যার, কিন্তু এটা তো আপনার জন্য করা হচ্ছে"।
"আমার জন্য? ওহ। তা ঠিক। আচ্ছা। আমি বসছি। আপনি রান্না হলে জানান"।
"ঠিক আছে স্যার"।
নীল স্যুটকেস থেকে তিতিরের দেওয়া সোয়েটারটা বের করল। মেরুন রঙের সোয়েটার। কলেজে পড়ার সময় টিউশন পড়িয়ে টাকা জমিয়ে এই সোয়েটারটা তাকে কিনে দিয়েছিল। তিতির বলেছিল "এই সোয়েটারটা যখন পরবে, মনে করবে আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরে আছি"।
সোয়েটারটা পরে বেশ খানিকক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রইল নীল। চোখ বন্ধ করে তিতিরের মুখটা মনে করার চেষ্টা করল।
মিনিট পাঁচেক সে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। এই গাড়িটা তুষারবাবু ঠিক করে দিয়েছেন কাছাকাছি ঘোরার জন্য। নীল হন হন করে বাংলো থেকে বেরিয়ে গেল।
সে ভুলেই গেছিল তার জন্য পরোটা হচ্ছে। তুষারবাবু বাংলোর পিছনের দিকে ছিলেন বলে তাকে দেখতে পেলেন না।
গাড়িতে উঠে নীল বলল "এখান থেকে শিলিগুড়ি কতক্ষণ?"
ড্রাইভার বলল "বাজার যাবেন না?"
নীল বিরক্ত হল "আহ, যেটা জিজ্ঞেস করছি জবাব দিন"।
"দু ঘন্টা লাগবে"।
"চলুন"।
"কিন্তু আপনি তো বললেন লোকাল ঘুরবেন"।
"আপনার যেতে অসুবিধা আছে?"
"না অসুবিধা কেন হবে?"
"চলুন তাহলে"।
নীল বলল "খেয়েছেন সকালে?"
"হ্যাঁ স্যার"।
"কী খেয়েছেন?"
"ভাত খেয়ে এসছি স্যার"।
"রাস্তায় কোথাও একটা দাঁড়াবেন তো। আমার খাওয়া হয় নি"।
"আচ্ছা স্যার"।
নীল বসে বসে শিষ দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বলল "এখানে একটা নদী আছে না? কী যেন নাম?"
"নেওড়া স্যার"।
"নেওড়া?"
"হ্যাঁ স্যার"।
"জঙ্গল আছে?"
"হ্যাঁ স্যার। মাঝখানে চিতাবাঘ বেরিয়েছিল"।
"তাই? ওখানে নিয়ে যাবেন?"
"কিন্তু স্যার এখন তো আপনি শিলিগুড়ি যাচ্ছেন"!

“হ্যাঁ ঠিক। এখন তো শিলিগুড়ি যাচ্ছি। কাল নিয়ে যাবেন?”
“ঠিক আছে স্যার”।
“চিতাবাঘ দেখা যাবে?”
“সেটা কী করে বলব স্যার”।
“হ্যাঁ। ঠিক ঠিক। সেটা কী করে বলবেন আপনি। কী হল দাঁড়ালেন কেন?”
“খাবেন বললেন যে”!
“ওহ খাব বলেছি না! আচ্ছা ছেড়ে দিন, আপনি চলুন। শিলিগুড়িতে গিয়েই খাব”।
“আচ্ছা”।
“আচ্ছা, দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমি খেয়ে নি”।
গাড়ি দাঁড়াল। নীল নামল। একটা ছোট হোটেল। ভিড় আছে যথেষ্ট। বসে বলল “কী আছে ব্রেকফাস্টের জন্য”?
“আলুপরোটা আছে স্যার”।
“আচ্ছা, দিন”।
বসে মোবাইল ঘাটা শুরু করল নীল।

পর্ব ১০

“এ পৃথিবীটা হেরে যাওয়া মানুষদের জন্য না”।
কথাটা বার বার ডায়েরীর পিছনের পাতাগুলোয় বড় বড় করে লিখে রাখত তোরসা। ডায়েরীটায় অনেকদিন কিছু লেখা হয় নি। টেবিলের ওপরেই ছিল।
আজ পিছনের পাতাটা খুলে দেখল।
ডিপ্রেশনের সময়টা ডায়েরীটাই ভরসা ছিল তার।
এখানে প্রথম প্রথম শীত লাগলে সব সোয়েটার পরে কম্বলের তলায় গুটিশুটি মেরে থাকত। ধীরে ধীরে শীত সহনীয় হয়ে গেছে।
ডিপ্রেশনও অনেকটা শীতের মতই। অভ্যাস হয়ে গেলে অতটা কষ্ট হয় না।
সামান্য মোবাইলের গেমও হয়ে উঠতে পারে ডিপ্রেশন কাটাবার অমোঘ উপায়।
কিংবা শপিং। বাজার থেকে একই রঙের চারটে সোয়েটার কিনেছে সে।
আদৃতাকে অফিসের পর বলে দিয়েছিল বাড়ি চলে যেতে, আদৃতা দু চারবার জিজ্ঞেস করেছে, “তুই শিওর?” তোরসা বলেছে, “হ্যাঁ শিওর। যা এবার”।
আদৃতা চোখ নাচিয়ে বলেছে “গোপন ডেটিং আছে নাকি?”
তোরসা হাসিমুখে বলেছে “আছে তো। তুই গেলেই আমি ওই হ্যান্ডুর সাথে ঘুরতে বেরোব”।
আদৃতা প্রথমে সত্যি ভেবেছিল।
তারপর বুঝেছে তোরসা ইয়ার্কি মারছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেছে।
তোরসা সোয়েটার কিনল। অনেক খুঁজে পছন্দের রঙের চুড়ি কিনল। একগাদা সব্জি বাজার করল। মাংস কিনল। তারপর সব কিছু নিয়ে একা একা চড়াই ভেঙে কোয়ার্টারে ফিরল।
মাসীকে ফোন করে ছুটি দিয়ে দিল। নিজে অনেকক্ষণ বসে বসে রান্না করল।
টেবিলে সাজিয়ে রাখল খাবারগুলো।
সবশেষে ডায়েরীটা নিয়ে বসল।

অনেকক্ষণ লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল। ডায়েরীতে লেখার সময় কোন জায়গাটা চোখের জল লেগে আছে এখনও মুখস্ত বলে দিতে পারে তোরসা।
সাড়ে আটটা বাজল।
তোরসা উঠল। ডায়েরীটা যত্ন করে খাটের উপর রাখল।
আলমারি থেকে সব থেকে পছন্দের শাড়িটা বের করল।
আধঘন্টা ধরে যত্ন করে সাজল। চোখে কাজল দিল। ঠোঁটে লিপস্টিক। নখে নেলপালিশ।
তৈরী হয়ে গেলে দরজায় তালা দিয়ে রাস্তায় নামল।
জাঁকিয়ে শীত পড়েছে।
রাস্তা সুনসান। খানিকটা হাঁটার পর তোরসা অনুভব করল এক মাতাল পিছু নিয়েছে তার।
সে ঘুরে দাঁড়াল। মাতালটা কী বুঝল কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে অন্য দিকে দৌড় মারল।
সে দৃঢ় পায়ে হেঁটে বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল।
কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিল। তারপর বাংলোর গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকল।
আলো জ্বলছিল সামনের ঘরে।
তোরসা কলিং বেল টিপল।
তুষারবাবু দরজা খুলে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন “আপনি?”
তোরসা বলল “নীল আছে?”
তুষারবাবু বললেন “স্যার তো ঘুমাচ্ছেন সন্ধ্যে থেকে”।
তোরসা বলল “আমি অপেক্ষা করছি, ডেকে দিন”।
তুষারবাবু দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন।
তোরসা ড্রয়িংরুমে এসে বসল। তুষারবাবু তার সামনে এসে দাঁড়ালেন “আপনি ব্যাঙ্কে আছেন না ম্যাডাম?”
তোরসা বলল “হ্যাঁ। আপনি ডাকুন ওনাকে”।
তুষারবাবু ইতস্তত করে বললেন “স্যার যদি রাগ করেন?”
তোরসা বলল “রাগ করবেন না। ডাকুন। আর শুনুন, উনি এলে আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াবেন। কনফিডেন্সিয়াল কিছু কথা বলার আছে তো। বলা যাবে না”।
তুষারবাবু কয়েক সেকেন্ড তোরসার দিকে তাকিয়ে “আচ্ছা ম্যাডাম” ঘরের ভিতরে চলে গেলেন।
তোরসা অপেক্ষা করছিল।
মিনিট পাঁচেক পরে নীল এসে দাঁড়াল।
তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল “তুমি?”
তোরসা বলল “হ্যাঁ। বল কী বলার আছে তোমার?”
নীল সোফায় বসল। সোফার ওপরে পা তুলে বাবু হয়ে বসল কয়েক সেকেন্ড পরে।
তারপর বলল “তিনটে ঘুমের ওষুধ খেয়েছি তিতির”।
তোরসা কিছু বলল না।
নীল বলল “এই যে ঘুমের ওষুধ খেয়েছি, দেড় ঘন্টা হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই আমার হ্যালুসিলেশন। তুমি নিশ্চয়ই তুমি না তাই না?”
তোরসা বলল “হ্যাঁ আমিই। ভাল করে দেখো। দেখতে পাচ্ছ না?”
নীল চোখ বড় বড় করে তোরসাকে দেখার চেষ্টা করল। দু হাত দিয়ে নিজের চোখ মুছল। তারপর ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল “আমি আসলে এখন স্বপ্ন দেখছি। সেই লাল শাড়িটা, যেটা গড়িয়াহাট থেকে কিনেছিলে, পরে আছ। এই শীতে সোয়েটার পর নি, কিচ্ছু পর নি। না না। তিনটে ঘুমের ওষুধ খেলে

কেউ জেগে থাকে নাকি? ধুস?"
তোরসা বলল "কেন ডাকছিলে ব্যাঙ্কে এসে সেটা বল, আমি জানতে এসেছি"।
নীল বলল "তিতির সোনা, তোমায় চিতাবাঘের সামনে ছেড়ে দেব। এইটুকু ছোট্ট শরীর, খাবলে খাবলে খাবে চিতাবাঘ"।
তোরসা বলল "চিতাবাঘ? প্ল্যান চেঞ্জ করলে?"
নীল বলল "আমার খুব ঘুম পেয়েছে। এই সব হ্যালু হ্যালু খেলা আমার আর ভালো লাগছে না। স্বপ্নের মধ্যে কী সব দেখে যাচ্ছি। তিতির, আমার তিতিরপাখি, তুমি এখন বাসায় ফিরে যাও"।
তোরসা বলল "আমি আর কোথাও ফিরে যেতে আসি নি নীল। তুমি বল তোমার কী বলার আছে?"

পর্ব ১১

নীল বলল "তোমার ছেলে বন্ধুদের খবর কী? যাদের সঙ্গে তুমি আমায় লুকিয়ে গল্প করতে? আমায় লুকিয়ে ঘনিষ্ঠ হতে?"
তোরসা বলল "এখনও সন্দেহ করে বেড়াচ্ছ? তা বেশ তো, দেখতে পারছ না? তারা আমার চারপাশে বসে রয়েছে, আমার সঙ্গেই তারা থাকে"!
নীল জোরে জোরে মাথা নাড়াল "ঠিক, তিতিরপাখি, ঠিক। তুমি ঠিক বলেছ। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি জানি, আমি ঠিক জানি তারা তোমার চারপাশেই বসে রয়েছে। আমি এখনও স্বপ্নে দেখি আমি যখন থাকি না তারা তোমার কাছে আসে, তোমায় আদর করে। আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়, ইচ্ছা করে তোমাকে ওদের সঙ্গে মেরে, পুঁতে দি"।
তোরসা বলল "তারা তোমায় কিছু বলে না?"
নীল তোরসার দিকে তাকিয়ে "বলে তো, তারা বলে তোর তিতিরকে একদম বিশ্বাস করবি না, একদম না। মেয়েটা কাউকে ভালোবাসে না আসলে। আমাদের বাসে নি, তোকেও কোনদিন ভালবাসে নি। আমার ঘুম হয় না তিতির, আমি রাতের পর রাত জেগে বসে থাকি। পাঁচটা বছর কেটে গেল। রাতের পর রাত শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে থাকি। তুমি আমাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছ। ফোন নাম্বার পেতে কত কষ্ট করতে হয়েছে আমায়। এবার পেয়েছি আমি। তোমার মুখ, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব। ওই মুখ আর কোন ছেলেকে দেখতে হবে না আর। কারও হতে দেব না তোমাকে আমি। কেন আমায় ছেড়ে চলে গেলে তুমি!" নীল অস্থির হয়ে উঠছিল।
তোরসা বিচলিত হল না, শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল "শ্রমণা কেমন আছে নীল? খুব ভালোবাসে তোমায়? তোমরা বিয়ে করছ কবে?"
নীল দুহাতের তালু ঘষতে ঘষতে বলল "খুব বড় স্বপ্ন দেখছি তো আজকে। এরকম স্বপ্ন রোজ রোজ দেখি না"।
তোরসা একই স্বরে একই প্রশ্ন রিপিট করল "শ্রমণা কেমন আছে নীল? বিয়ে করছ কবে?"
নীল তোরসার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর হো হো করে হাসতে শুরু করল।
তোরসা বলল "কী হল, হাসছ কেন? প্রশ্নটা কি খুব কঠিন প্রশ্ন করেছি?"
নীল বলল "আমি কাউকে ভালবাসি না। কাউকে না। আমায় কেন ছেড়ে দিয়ে গেলে তুমি"?
তোরসা বলল "আমায় তুমি দিন রাত সন্দেহ করেছ নীল। আমার মোবাইল ঘাটছ, আমার অজান্তেই আমাকে ফলো করছ। মেরেছ। বারবার প্রশ্ন করে গেছ। তারপর... বলব তোমায়? তারপর কী করেছ?"
নীল দুহাতে নিজের চুল আঁকড়ে ধরে বসে রইল। তারপর বলল "তুমি চলে যাও। আমি আর তোমায় স্বপ্নে দেখতে চাই না তিতির। চলে যাও তুমি"।

তোরসা বলল “আমি তোমার স্বপ্নে নেই নীল। আমি বাস্তবেই আছি। তোমার সামনে বসে”।
নীল অবিশ্বাসীর মত তোরসার দিকে তাকিয়ে থাকল। পকেট থেকে মোবাইল বের করল। তোরসার ফটোর সঙ্গে সামনে বসা তোরসাকে মিলিয়ে দেখল।
তারপর উঠে তোরসার কাছে এসে দাঁড়াল। তোরসাকে ছুঁল।
তোরসার পায়ের কাছে মেঝেতে বসে পড়ল।
ক্লান্ত স্বরে বলল “তোমার ফোন বিজি থাকে এখনও। কারা ফোন করে তোমায় তিতির? তোমার বয়ফ্রেন্ড?”
তোরসা বলল “তোমার গার্লফ্রেন্ডও করে কখনো সখনও। ফোন করে হুমকি দেয়। তোমার জীবন থেকে যেন সরে যাই”।
নীল বলল “তিনটে ঘুমের ওষুধে আজ অবধি কারও কিছু হয় নি। আমি রোজ একটা একটা করে বাড়াব। কাল চারটে খাব। পরশু পাঁচটা। তারপরের দিন ছ’টা। তারপরের দিন সাতটা। ঘুম আসবে না এভাবে তিতির পাখি?”
তোরসা সোফা থেকে নেম নীলের পাশে মেঝেতে বসল। তারপর বলল “কী ভুলতে চাও তুমি?”
নীল বলল “তোমার অবিশ্বাসী চোখটা। তোমার শরীরটা। যেটাকে বারবার আঘাত করেছি। জোর করে দখল করেছি। যেদিনের পরে তুমি সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেলে আমার জীবন থেকে। রোজ ভোলার চেষ্টা করি”।
তোরসা কয়েক সেকেন্ড নীলের দিকে তাকিয়ে বলল “লিস্টে আরেকটা জিনিস অ্যাড করে নাও নীল”।
নীল বলল “কী?”
তোরসা বলল “তোমার একটা চার বছরের মেয়েও আছে”।
নীল হাঁ করে তোরসার দিকে তাকাল। বলল “কোথায়?”
তোরসা উঠল। বলল “অ্যাসিড বাল্ব নিয়ে মুখে মেরো আমার। পুড়িয়ে দিয়ে যেও। আর কোন ছেলে কোনদিন আমায় দেখতে না পারে। এখন মারবে? অপেক্ষা করব?”
নীল দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল।
তোরসা ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে গেল।
বাইরে প্রবল শীতের মধ্যে তুষারবাবু চুপচাপ একা একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।
তোরসা বলল “আমার সঙ্গে একটু চলুন তো, পৌঁছে দেবেন”।

পর্ব ১২

দিন ৪
“আজ আমি বাংলোতে যাই নি”।
মাসী এসে শুরু করল।
তোরসা কিছু বলল না। চুপচাপ বসে ছিল।
মাসী বলে চলল “কাল জানো আমার কী অবস্থা করেছে? সকালে রান্না করে বসে আছি বলল পরোটা খাব। পরোটা করছি এই সময় কেয়ারটেকারবাবু এসে বললেন স্যার গাড়ি করে পালিয়েছে। আমি পরিষ্কার বলে দিলাম, দেখো বাপু, তোমার টাকা তোমার কাছে রাখো, আমি আর যাব না। কেয়ারটেকারবাবু বাড়ি অবধি চলে এসছিল। আমি শুনিনি। রাত্তিরে কী করেছে কে জানে, হোটেল থেকে এনেছে বোধ হয়”।
তোরসা বলল “আজ মাছ মাংস কিছু খাব না মাসি। নিরামিষ কোর”।
মাসী অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বলল “একী কান্ড! এ দেখি বিড়াল বলে মাছ খাব না! কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ?”
তোরসা একটু থেমে বলল “হ্যাঁ, শরীর খারাপ”।

মাসী বলল “সোয়াবিন করে দেব?”
তোরসা বলল “হ্যাঁ, তাই কর, আর শোন, দুধটাকে ঘন করে জাল দিয়ে রাখো। আমি পায়েস বানাবো”।
মাসী বলল “শরীর খারাপ, পায়েস খাবে? তুমি কেন বানাবে, আমিই বানিয়ে দিচ্ছি।”
তোরসা বলল “না না, আমি বানাবো। যা বললাম কর তো”।
মাসী গজগজ করতে লাগল “শরীরের আর দোষ কী! সারাক্ষণ শুধু উল্টোপালটা খেয়ে যাবে। পেট খারাপ তো হবেই”।
তোরসা বলল “তুমি রান্না করে যাবার সময় ডেকো, আমি একটু শুই। তুমি গেলে পায়েস করব”।
মাসী বলল “যাও। অফিস যাবে তো আজ?”
তোরসা বলল “দেখি, নাও যেতে পারি”।
কলিং বেল বেজে উঠল। তোরসা বলল “মাসী দেখো তো, পেপারের বিল বোধ হয়”।
মাসী বেরোল। দরজা খুলে আবার রান্নাঘরে এসে বলল “এই”।
তোরসা বলল “কী হল?”
মাসী উত্তেজিত গলায় বলল “ওই পাগলা ছেলেটা! এখানে কী করতে এসছে?”
তোরসা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল, বলল “তুমি রান্না কর। আমি দেখছি”।
মাসী বলল “তুমি চেনো নাকি?”
তোরসা বলল “তুমি রান্না কর”।
দরজা খোলা ছিল। নীল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ দুটো লাল হয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে সারারাত ঘুমোয়নি। তোরসা বলল “তুষারবাবু কি বাইরে দাঁড়িয়ে?"
নীল বলল "না চলে গেছেন"।
তোরসা বলল "এসো”।
নীল ঘরে ঢুকল।
তোরসা বলল “মাসী আছে, কোন সীন ক্রিয়েট কোর না”।
নীল বলল “আমি কোন সীন ক্রিয়েট করতে আসি নি”।
তোরসা বলল “বস”।
ড্রয়িং রুমের সোফায় বসল নীল। চোখে মুখে অস্থির ভাব।
তোরসা বলল “তুমি খেয়েছ কিছু সকালে?”
নীল মাথা নাড়ল।
“খাবে?”
“আমাদের মেয়ে কোথায় তিতির?”
তোরসা বলল “খাবে না?”
নীল বলল “আমি কিছু খেতে পারব না যতক্ষণ আমার মেয়েকে দেখব”।
তোরসা বলল “দেখবে? দেখে কী করবে?”
নীল বলল “আমরা সংসার করব। তুমি বুঝতে পারছ না তিতির? আমার মেয়ে! আমাদের মেয়ে! আমাদের স্বপ্নগুলো, যেগুলো আমরা একসাথে দেখতাম, সব ভুলে গেছ তুমি?”
তোরসা ঠান্ডা গলায় বলল “গলা নামাও নীল। মাসী আছে। এখানে আমায় থাকতে হবে, ভুলে যেও না”।
নীল এগিয়ে এসে তোরসার হাত ধরল “প্লিজ তিতির, আমার মেয়েকে দেখাও। প্লিজ”।
তোরসা উঠল। বলল “এসো”।
বেডরুমে গেল। আলমারী খুলল। লকার থেকে একটা কাগজ বের করল, “এ নাও”।

নীল বলল “এটা কী?”
তোরসা বলল “ওর ডেথ সার্টিফিকেট। জন্মের পরেই। ডাক্তার বলেও ছিলেন বাঁচানো যাবে, গেল না। ভাল দিনেই এসেছ। আজ ওর জন্মদিন ”।
নীল অবিশ্বাসী চোখে সার্টিফিকেটটার দিকে তাকিয়ে থাকল। সেটা নিয়েই মেঝেতে বসে পড়ল। মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল।
তোরসা পাথরের মত বসে রইল।
মাসী শব্দ শুনে বেডরুমে চলে এসছিল। তোরসা বলল “মাসী তুমি রান্না হয়ে গেলে চলে যেও”।
মাসী অবাক হয়ে নীলকে কাঁদতে দেখছিল। চোখে অনেক প্রশ্ন।
তোরসা বলল “দুধ জাল দিয়ে যেতে ভুলো না মাসী। আজ আমাদের মেয়ের জন্মদিন”।
মাসী স্তম্ভিত মুখে নীলের দিকে আরেকবার তোরসার দিকে তাকাল। দাঁড়াল না আর। রান্নাঘরে চলে গেল।
অনেকক্ষণ পরে নীল বলল “আমি তোমাকে কী বলি নি তিতির! পাগলের মত খুঁজে বেরিয়েছি তোমায়। তোমাকে শেষ করে দেব বলে। তোমার মুখ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেব ভেবে এসছি কতবার! আর তুমি...”
তোরসা উঠল, “পায়েস খেয়ে যেও, জন্মদিনের পায়েস”।

শেষ পর্ব

“স্যার খাবেন না?”
তুষারবাবু ঘুম ভাঙালেন। ঘর অন্ধকার। নীল হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালল। ঘুম জড়ানো গলায় বলল “ক’টা বাজে?”
“সন্ধ্যে সাতটা বাজে। আপনি তো সারাদিন কিছু খান নি।”
“আমি? খেয়েছি”।
“কী খেয়েছেন স্যার?”
“পায়েস খেয়েছি”।
“ম্যাডামের ওখানে?”
“হ্যাঁ। আজ আর কিছু খাব না তুষারবাবু। কাল আমি চলে যাব”।
“স্যার, আপনি সাতদিন থাকবেন কথা ছিল তো”। অবাক গলায় প্রশ্ন করলন তুষারবাবু।
নীল ক্লান্ত স্বরে বলল “আমার কাজ হয়ে গেছে তুষারবাবু। আর থাকার দরকার নেই। আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, বসুন না”।
তুষারবাবু চেয়ার টেনে বসলেন।
নীল বলল “আপনি খেয়েছেন? মাসী তো আসেনি আজ”।
তুষারবাবু বললেন “আমি তো চাল ডাল আলু ফুটিয়ে খেয়ে নি রোজ। গেস্ট না আসলে মাসী রাখার প্রয়োজন নেই তো”।
“আগের মাসীর খোঁজ নিয়েছেন? কেমন আছে?”
“ভাল আছে। ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করবেন না স্যার”।
“এখন কি বৃষ্টি পড়ছে? শব্দ আসছে মনে হচ্ছে।”
“হ্যাঁ স্যার। আবার সেই শুরু হয়েছে”।
“এই বাংলোটা বেশ ভাল। বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়। আমার মনে হচ্ছে কতদিন আমি এই শব্দটা শুনি নি। কেমন একভাবে হয়ে যাচ্ছে”।

তুষারবাবু উত্তর দিলেন না।
"আপনি এখানে একা একা কী করেন তুষারবাবু?"
"কী করব স্যার? কিছুই তো করার নেই। একা একা পাহারা দি। বাংলো বিক্রি হয়ে গেলে সেটাও হবে না আর। এখানে যে চা বাগানগুলো ছিল, সেগুলোও তো অনেকগুলো বন্ধ হয়ে গেল। বাকিগুলো ধুঁকছে। ভূতের মত মড়া আগলে আছে কিছু লোকজন"।
"আমাদের জীবনটাই তো তাই তুষারবাবু। নিজেদের মড়া আগলেই কাটিয়ে দেওয়া"।
তুষারবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন "স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"
"করুন"।
"ম্যাডাম কি আপনার কেউ হন?"
নীল তুষারবাবুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল "কী করবেন জেনে?"
তুষারবাবু বললেন "এমনি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে তো কেউ আসেন না, এতদিন পরে আপনি এলেন, কাল চলে যাবেন ভাবতে কেন জানি না খুব খারাপ লাগছে স্যার"।
নীল কিছু বলল না।
চুপচাপ বসে রইল।
তুষারবাবু বললেন "ড্রাইভার রতন ছেলেটা বলছিল ভ্যালিতে যাবেন বলেছেন। যাবেন না?"
নীল বলল "নাহ। আর গিয়ে কী করব। ফিরে যাই"।
তুষারবাবু বললেন "সুন্দর জায়গা স্যার। অনেকে আসেন ঘুরতে। মাঝে লেপার্ড বেরিয়েছিল বলে কাগজে লেখালেখিও হয়েছিল"।
নীল বলল "আপনি দেখেছেন কোনদিন লেপার্ড?"
তুষারবাবু বললেন "না স্যার, এখানে সেসব দেখি নি কোনদিন। তাছাড়া আমি তো বেরোইও না খুব বেশি"।
নীল বলল "ইচ্ছা করে নি দেখতে লোকের মুখে শুনে?"
তুষারবাবু ম্লান হাসলেন "ছোটবেলায় যখন খেলার বয়স ছিল তখন বাবার সঙ্গে ধুপকাঠি বেচতে বেরোতাম স্যার। তখন থেকেই কৌতূহলটা কমে গেছে। আপনার ওপর কেন জানি না একটা মায়া পড়ে গেল এ ক'দিনে। তাই ম্যাডামের কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। নইলে তাও জিজ্ঞেস করতাম না"।
নীল বলল " ভাল করেছেন জিজ্ঞেস করেছেন। বেশ করেছেন। আপনার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই তুষারবাবু। আপনি শৈশবে ধুপকাঠি বেচতে বেরিয়েছেন, আর আমার এই তিরিশ বছর বয়সে আজ সকাল অবধি শৈশব ছিল। এক ধাক্কায় আমি বড় হয়ে গেলাম আজকে। অনেকটা। শুধু ধাক্কাটার জন্য অনেকটা মূল্য দিতে হল"।
তুষারবাবু বললেন "আবার আসবেন স্যার। খুব ভাল লাগল আপনার সঙ্গে কথা বলে। কেউ তো এভাবে বসিয়ে কথা বলে না। সবাই কুকুর বেড়ালের মত ব্যবহার করে। তাতেও অপেক্ষা করে থাকি। যদি কেউ আসে। বকা ঝকা করলেও কথা তো বলবে"!
নীল মাথা নাড়ল, "আমি আর কোনদিন আসব না তুষারবাবু। আমার আর কোনোদিন আসা হবে না"।
তুষারবাবু আর কথা বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন।
কিছুক্ষণ পরে নীল বলল "আপনি এবার নিজের রান্না বসান তুষারবাবু। আমিও দেখি ঘুমানোর চেষ্টা করি"।
তুষারবাবু বললেন "আপনি কিছুই খাবেন না তাহলে?"
নীল বলল "এক কাজ করুন, এক মুঠো ভাত বেশি নিন। আপনার সঙ্গে বসে খাই। আলুসেদ্ধ ভাতই খাই"।
তুষারবাবু চমকে উঠে বললেন "আমার সঙ্গে খাবেন?"
নীল বলল "কেন? কী অসুবিধা? আচ্ছা এক কাজ করুন, চালে ডালে বসিয়ে দিন। খিচুড়ি খাই। পারবেন

না?”
তুষারবাবু বললেন “পারব স্যার। কিন্তু খাবেন তো? আমি রান্না করলাম আর আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন”।
নীল বলল “হবে না। বললাম না আপনাকে, আমার শৈশব কেটে গেছে। চিন্তা করবেন না। আপনি বসিয়ে দিন”।
#
দিন-৫
“ আমি রাখব গেঁথে তারে রক্তমণির হারে,
বক্ষে দুলিবে গোপনে নিভৃত বেদনাতে”॥
বৃষ্টি রাতেই থেমেছে। তবে মেঘ পুরোপুরি কাটে নি।
নীলের গাড়ি এসে গেছিল। তুষারবাবুর হাজার কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও নীল নিজেই স্যুটকেস আর কিট ব্যাগটা গাড়িতে তুলল।
নীল মানিব্যাগ থেকে এক হাজারটাকা বের করল, “এই টাকাটা আপনি রাখুন তুষারবাবু”।
তুষারবাবু বললেন “না না স্যার, আমি মাইনে পাই তো। আপনি আমাকে টাকা দেবেন কেন?”
নীল বলল “রাখুন তুষারবাবু। আপনি না নিলে আমি কষ্ট পাব”।
তুষারবাবু টাকাটা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।
নীল গাড়িতে উঠল। ড্রাইভারকে বলল “চলুন”।
ড্রাইভার বলল “কোথায় স্যার? লেপার্ড দেখতে?”
নীল বলল “নাহ বাগডোগরা চলুন”।
গাড়ি স্টার্ট দিল। নীল তুষারবাবুকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল।
গাড়িটা খানিকটা যাবার পর নীল বলল “আপনাকে অনেক জ্বালাতন করেছি আমি। একটা শেষ বারের মত রিকোয়েস্ট করব?”
ড্রাইভার হাসল “বলুন স্যার”।
“আপনি একটু বাজারে ব্যাঙ্কের সামনে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াতে পারবেন?”
“আচ্ছা স্যার”।
#
তোরসা ক্যাশ কাউন্টারে বসেছিল। আজকেও বিজনদা আসে নি। বেশ ব্যস্ততার সঙ্গে কাউন্টার সামলাচ্ছিল।
নীল ব্যাঙ্কের ভিতর ঢুকল। তোরসার ব্যস্ততা দু চোখ ভরে দেখল।
তারপর উঠল। ধীর পায়ে ব্যাঙ্ক থেকে বেরোল। আর ফিরে তাকাল না। মনে মনে বলল “ভালো থেকো তিতির পাখি, আর কোনদিন তোমাকে জ্বালাতে আসব না”।
গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল এই সময় শুনতে পেল “পালাচ্ছ শেষমেষ?”
নীল দাঁড়িয়ে পড়ল। তোরসা কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।
নীল বলল “হ্যাঁ। ভেবেছিলাম আর জ্বালাব না তোমাকে। কিন্তু শেষবারের মত দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না তিতির”।
তোরসা বলল “তুমি কোনোদিনও বড় হবে না বল?”
নীল হাসল “জানি না। হয়ত হব কোনদিন। তুমি দেখতে পাবে না। আমি এলাম। ভাল থেকো তিতির”।
“তুমিও ভাল থেকো। আর শোন”।
“বল”।
“কোনদিন এসো না আমার সামনে”।

“কথা দিলাম তিতির, এলাম”।
নীল গাড়িতে উঠল।
ড্রাইভারকে বলল “বাগডোগরা না, আপনি বরং আমাকে ওই লেপার্ড দেখাতেই নিয়ে চলুন”।
ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল।
তোরসা দাঁড়িয়ে রইল।
একা একা...

ডুপ্লেক্স

১.

অনন্যার রান্না হয়ে গেছিল সকালের। বর রূপ খেয়ে চলে গেছে খানিকক্ষণ আগে।

ছেলে বুবাই ঘুমাচ্ছে। ওকে আর ওঠায় নি অনন্যা। পরীক্ষা শেষে এক দিন মাত্র ছুটি পেয়েছে, ঘুমাক।

টিভিতে "লীলাময়ী" র রিপিট টেলিকাস্ট চালিয়ে সবে বসেছে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

অনন্যা বিরক্ত হল। নিশ্চয়ই সেলসম্যান।

মনের সুখে গালাগাল দেবে বলে উঠে দরজা খুলে দেখল তারই বয়সী এক মেয়ে দাঁড়িয়ে। অনন্যা বলল "বলুন?"

মেয়েটি বলল "রূপ রায়ের বাড়ি?"

অনন্যা বলল "হ্যাঁ। "

মেয়েটা তার দিকে ডান হাত এগিয়ে দিয়ে বলল "হাই অনন্যা। আমি রুচিরা। তোমার সতীন। গত মাসে আমার আর রূপের বিয়ে হয়েছে"।"

অনন্যা হাঁ করে রুচিরার দিকে তাকাল।

সিরিয়ালের দুটো বিয়ে শেষে তার জীবনেও?

মাথা ঘুরাচ্ছিল, কোন মতে দাঁড়িয়ে বলল "মানে?"

রুচিরা মোবাইল বের করে গ্যালারি খুলল এবং তার এবং রূপের বেশ কয়েকটা ঘনিষ্ঠ ছবি বের করে বলল "গত মাসে অফিস ট্যুরের ঢপ মেরেছিল না? তখন আমরা হানিমুনে গেছিলাম। আন্দামান"।

এবার আর পারল অনন্যা। মেঝেতেই বসে পড়ল।

২

"আমি ভেবেছিলাম চুপ করেই থাকব। তোমায় কিছু বলব না। পরে এত একা লাগতে শুরু করল যে চলে আসাই মনস্থির করলাম। দুটো সংসার চালানোটাও একটু চাপ, তাই না?"

রুচিরা বলল।

অনন্যা স্থবির হয়ে সোফায় বসে আছে। টিভিতে নিজের মত সিরিয়াল চলে যাচ্ছে, কানেও আসছে না কিছু। রুচিরা বলল "তুমি খুব শকড? আমিও হয়েছিলাম যখন প্রথম জানতে পেরেছিলাম।"

অনন্যা বলল "বিয়ের আগে জানতে পেরেছিলেন?"

রুচিরা মাথা নাড়ল "হ্যাঁ। ফেসবুকে আলাপ। তারপর দেখা। বলত না কিছুই। একদিন তুমি ফোন করলে ওকে। হঠাৎ করেই চোখে পড়ে গেল তোমার নামটা ফোনে ওয়াইফ নামে সেভ করা। তখন চেপে ধরতে বলে ফেলল আর কী! আমি রেগে গেলাম। কেন বলেনি এদ্দিন। পরে ঠিক করলাম নাহ, ছাড়ব না। বিয়ে করব আগে। তারপর লাইফটা নরক করব"।

অনন্যা থতমত খেয়ে বলল " কেমন নরক?"

রুচিরা বলল "আমি আজ থেকে এ বাড়িতেই থাকব"।

৩

বুবাই ক্লাস থ্রিতে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে অনন্যার কাছে এসে রুচিরাকে দেখে চিনতে পারল না। রুচিরার দিকে তাকিয়ে বলল "তুমি কে?"

রুচিরা হেসে বলল "তোমার ছোট মা"।

অনন্যা একটু চমকাল কিন্তু কথা বলল না।

রুচিরা উঠে বুবাইকে কোলে নিয়ে বলল " এখানে এসে বাঁচলাম বিশ্বাস কর। সারাক্ষণ একা একা থাকা যায় নাকি? আমি ভাগ্যিস এই ডিসিশনটা নিয়েছি"।

বুবাই কাঁদো কাঁদো গলায় বলল "আমি বড় হয়ে গেছি। কারো কোলে উঠি না আমি"।

রুচিরা বুবাইয়ের গাল টিপে বলল " আমাদের কাছে তো ছোট তুমি বাবা। দেখবে এর পরে তোমার একটা ভাই বা বোন আসবে, তোমায় কত ভালবাসবে"।

লীলাময়ীর বর লীলাময়ীকে ছেড়ে আরেক মহিলার সাথে গিয়ে থাকছে। অনন্যা টিভিতে লীলাময়ীর মুখে নিজের মুখটা দেখতে পেল যেন।

৪

রূপকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। অনন্যা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও পেল না।

রুচিরা কিছুক্ষণ আগে "আমি একটু ঘুমিয়ে নি" বলে তাদের বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

অনন্যা বরাবরই কথা কম বলে। এবারে অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছে। বুবাইকে পড়তে বসাতে হত, পারে নি। বুবাই বেশ কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করে বুঝেছে মা পড়তে বসাচ্ছে না কোন কারণে। গম্ভীর হয়ে চ্যানেল চেঞ্জ করে কার্টুন দেখছে। অন্যদিন হলে অনন্যা পিঠে দুটো বাড়ি দিয়ে পড়তে বসিয়ে দিত। এদিন এতটাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আছে যে একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

কাজের মেয়ে সরস্বতী এসে ঘর ঝাঁট দেওয়া শুরু করেছে। বেডরুম থেকে এসে অবাক গলায় বলল "কে এসচে গো বুদি"?

অনন্যা কিছু বলার আগে বুবাই গম্ভীর গলায় বলল " ছোট মা"।

সরস্বতী বলল "সেটা কে?"

অনন্যা কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল "তাড়াতাড়ি কাজ কর তো, বেরোব একটু"।

সরস্বতী বলল " কুতায় যাবে?"

অনন্যা বলল "শ্মশানে"।

সরস্বতী বলল " উকানে কী গো বুদি? শুটিং আচে?"

অনন্যা বলল "মরণ আচে, মরণ। তুই কাজ করে যাবি?"

সরস্বতী ঘাবড়ে গিয়ে দ্রুত গতিতে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করল।

৫.

রুচিরা উঠল দুপুরে। চোখ মুখ ফুলিয়ে বসার ঘরে এসে বলল "বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছা করছে খুব।টোমাটো দিয়ে বিরিয়ানি আনাবে? সবাই মিলে খাই?"

বুবাই বিরিয়ানির ভক্ত। নাম শুনেই লাফাতে শুরু করল।

অনন্যা রেগে গিয়ে বলল "বিরিয়ানি না, তুই আমার মাথা খা"!

বুবাই কাঁদতে লাগল। রুচিরা বুবাইকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বলল "তুমি আবার এইটুকু সোনাকে বকছ কেন বল তো?"

অনন্যা বলল "আমি বাপের বাড়ি যাব। তুমি সংসার কর। সতীন নিয়ে থাকতে পারব না আমি"।

রুচিরা বলল "এ কেমন কথা? তুমি চলে গেলে রূপকে সাইজ করব কী করে? তুমি আগে ঠিক কর তুমি আমার দলে না ওর দলে?"

অনন্যা কয়েক সেকেন্ড রুচিরার দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল "বুবাইকে দাও, অনেক কার্টুন দেখেছে, এবার পড়তে বসাই"!

৬

অনন্যা বুবাইকে পড়াতে বসাল খাওয়ার পর। টিভি চলছিল। রুচিরা টিভি বন্ধ করে অনন্যাকে বলল "ওমা সাউন্ড হচ্ছে ও পড়বে কী করে?"

অনন্যা বলল "তুমি দেখলে দেখো, আমি দরজা বন্ধ করে পড়াই বরং"।

রুচিরা বলল "ধুস, তা হয় নাকি, দাঁড়াও আমি বরং ম্যাগাজিন পড়ি। আছে কোন ম্যাগাজিন?"

অনন্যা ম্যাগাজিনের স্ট্যাকটা দেখাল রুচিরাকে। রুচিরা ম্যাগাজিন পড়তে লাগল বসার ঘরে। অনন্যা বুবাইকে বেশ কয়েকটা অংক করতে দিয়ে বসার ঘরে এসে রুচিরাকে বলল "আচ্ছা তুমি রূপের বন্ধু না তো? কোন ইয়ার্কি মারছ না তো?"

রুচিরা হেসে মাথা নাড়ল "না। একচুয়ালি আমিও যেদিন তোমার ব্যাপারে জানলাম আমারও খুব,রাগ হয়েছিল। আমার ইচ্ছা করছিল তোমাকে মেরে ফেলি। মাথা ঠান্ডা হলে বুঝতে পারলাম আমার মত তুমিও প্রতারিত হয়েছো। তোমাদের সেক্স লাইফ কেমন?"

অনন্যা ইতস্তত করতে লাগল।

রুচিরা বলল "আমাকে বল। আমার সঙ্গে শেয়ার না করলে সমস্যা বাড়বে কিন্তু"।

অনন্যা রুচিরার মুখের দিকে তাকাল।

বলল "পরে বলব। এখন এসব নিয়ে আলোচনা করতে একেবারেই ইচ্ছা করছে না। ইন ফ্যাক্ট আমার মনে হচ্ছে সব ছেড়ে চলে যাই কোথাও"।

রুচিরা বলল "বিয়ের এলবামটা দেখাবে?"

অনন্যা উঠল।

৭

রুচিরা চুপ করে বসে অ্যালবাম দেখছিল। ছবিগুলো দেখা হয়ে গেলে বলল "আমারও এরকম বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল। সমস্যা হল আমি অনাথ। কাকা জ্যেঠুরা আমার বিয়ে দিত না এভাবে। রূপ যখন আমাকে বলেছিল বিয়ের কথাটা আমি ভেবেছিলাম পৃথিবীর সব থেকে খুশি মেয়ে আমি। আমি ভাবতে পারি নি ও গোটা একটা পরিবারকে চিট করছে। তোমার কখনো সন্দেহ হয় নি?"

অনন্যা মাথা নেড়ে বলল "সন্দেহ করার জন্য সময় লাগে। বুবাইকে সামলে আমার দিন কেটে যায়। ওর স্কুল, ওর হোম ওয়ার্ক,সব এত এত থাকে যে আর কোন কিছুর দিকে দেখব কী করে? তাছাড়া আমি ওর ফোন ঘাঁটি না। ঘাঁটার কথা মনেও আসে নি কোন দিন"।

রুচিরা হেসে বলল " তোমার নাম এখন মোবাইলে ঘর বলে সেভ করা আছে।ওয়াইফ নেই আর। আমি ওর মোবাইল দেখেছি ওর অজান্তেই। প্যাটার্ন লকটা দেখে নিয়েছিলাম একদিন। ঘুমাচ্ছিল ও। আমি ফোন দেখলাম। তোমার চাল এনো, তেল এনো ছাড়া কোন মেসেজ নেই। আর..."

অনন্যা জিজ্ঞাসু চোখে রুচিরার দিকে তাকাল "আর?"

রুচিরা বলল "কিছু না। শুধু বলি রূপের শাস্তি দরকার। খুব বড় কোন শাস্তি"।

অনন্যা বলল " মানে?"
রুচিরা ঠান্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল "মে বি ওর বেঁচে থাকার কোন দরকার নেই"।
অনন্যা শিউরে উঠে বলল " সেকী"!
রুচিরা বলল "আমরা ওকে ঠান্ডা মাথায় খুন করতে পারি। করবে?"

৮

অনন্যা চোখ বন্ধ করল। রূপের মুখটা মনে পড়ছে। ঝগড়া শেষে অপরাধী চোখদুটো মনে পড়ল। সে রুচিরাকে বলল "তোমার যদি মনে হয় তুমি ওকে নিয়ে থাকবে, আমি বুবাইকে নিয়ে সরে যাব। এসব খুন টুন করার কথা বলতে হবে না।"

রুচিরা তার হাত ধরে উত্তেজিত গলায় বলল "যে সব মানুষ একবার পলিগামিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তারা কি সারাজীবনে আবার এক নারীতে সন্তুষ্ট হবে? রূপ আবার অন্য কারো পেছনে ছুটবে। মে বি তোমারই?"

অনন্যা বলল "আমি আসব না তোমাদের মধ্যে। কিন্তু এই মেরে ফেলা ইত্যাদি বোল না। আমার মাথা কাজ করছে না"।

রুচিরা বলল " তোমার তো লাভ ম্যারেজ। যখন প্রেম করেছিলে কখনো মনে হয় নি রূপ চিট করতে পারে?"

অনন্যা বলল "ওর আমার সাথে বিয়ে হবারই কথা ছিল না। আমার বন্ধুর প্রেমিক ছিল ও"।

রুচিরা বলল " তারপর?"

অনন্যা বলল "আমি মিথ্যা বলে ওই সম্পর্ক ভেঙেছিলাম। মে বি তার শাস্তি আজ পেতে হচ্ছে। আচ্ছা তুমি তানিয়ার কেউ হও না তো?"

রুচিরা বলল "আমি তোমার সতীন ছাড়া আর কারো কিছু হই না। তারমানে রূপের মত তুমিও চিটার"।

অনন্যা এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল "আমি বুবাইয়ের কাছে গেলাম। তুমি কী চাও জানিও। সেভাবেই হবে। আমার মাথা কাজ করছে না"।

৯

বুবাই অংকগুলো করছিল আর অনন্যার ফ্ল্যাশব্যাকের মত পুরনো কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল।

রূপ তানিয়ার প্রেমের কাহিনী তাদের কলেজ বিখ্যাত ছিল। সর্বক্ষণ দুজন একসাথে।

সেদিনটা তানিয়া আসে নি।

সে ফিরছিল। রূপ হঠাৎ করেই তার সামনে বাইক নিয়ে এসে বলল "যাবি?"

অনন্যা কিছু না ভেবে রূপের পিছনে উঠল। গোটা রাস্তা বেশি কথা হয় নি তবে অনন্যা যখন রূপের কাঁধে হাত রেখেছিল,মনে হচ্ছিল তার শরীরে যেন বিদ্যুত খেলছে। মন্দিরতলার মাঠটা পেরোলে নির্জন রাস্তায় রূপকে সে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল। রূপ বাইক থামিয়ে বলেছিল "কী হয়েছে?'

অনন্যা বলেছিল "আমি তানিয়াকে হিংসা করি রূপ। ও তোকে ছোঁয়, আমার রাগ হয়। আমি তোকে ভালবাসি কোন দিন বুঝিস নি তুই?"

রূপ কয়েক সেকেন্ড থমকে বলেছিল "এসব কী বলছিস? চ নামিয়ে দিয়ে আসি"।

অনন্যা কিছু বলে নি। বাইক থেকে নেমে বলেছিল "চলে যা। আমি যেতে পারব"।

রূপ কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে চলে গেছিল।

অনন্যা একা থাকত ফ্ল্যাটে।

একা একা কেঁদেছিল অনেকক্ষণ। রাত এগারোটা নাগাদ কলিং বেল বাজল। দরজা খুলে দেখল রূপ দাঁড়িয়ে আছে। বেহেড মাতাল। সে দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। রূপ ঘরে ঢুকে তাকে পাগলের মত আদর করতে করতে বলেছিল " ইউ আর ম্যাজিশিয়ান। আমি জানি না তোর শরীরে কী আছে। আমায় টানছিস তুই বিলিভ মি"।

সারারাত পাগলের মত আদর করেছিল দুজনে। পরের দিন সকালে রূপের নেশা কাটল। তাকে বলল "তানিয়া যেন জানতে না পারে"।

অনন্যা হেসেছিল।

রূপ কলেজ পৌঁছনোর আগেই তানিয়াকে ফোন করে অনন্যা বলেছিল কাঁদো কাঁদো গলায় " আমি সরি রে। রূপ আমাকে প্রপোজ করেছিল। কাল সারারাত আমার ফ্ল্যাটে ছিল। আমি ওকে বারণ করলেও শোনে নি"।

তানিয়া মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েছিল,সেদিনের পর কলেজই যায় নি আর।

১০

বুবাই একটা অংক পারছিল না। অনন্যা দেখিয়ে দিচ্ছিল।

রুচিরা ঘরে এসে খাটে বসে বলল "তোমার শ্বশুর শাশুড়ি আসেন?"

অনন্যা বুবাইয়ের খাতার দিকে তাকিয়েই বলল "আসেন, কম। তবে আমার একার হবেন কেন, তোমারও তো"।

রুচিরা বলল " তা বটে। কেমন তারা?"

যেদিন রূপের বাড়ি গেছিল বিয়ে করে, সেদিনের কথা মনে পড়ল অনন্যার। ঘরে ঢুকতেই রূপের মা এল্লাদা কথা শোনাতে শুরু করলেন। কিছুই দেয় নি বাপের বাড়ি থেকে, ভিখিরি বাড়ি ইত্যাদি। একটা নতুন বাড়িতে গিয়ে, সম্পূর্ণ অচেনা লোকেদের সামনে বাবা মা সম্পর্কে এসব মন্তব্য নিতে পারছিল না অনন্যা। নিজের অজান্তেই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছিল। অথচ দেনা পাওনার কথার সময় রূপ বলেছিল তারা কিচ্ছু নেবে না। সে পণ বিরোধী। অথচ মা যখন এই কথাগুলো বলে চলল রূপ কিচ্ছু বলল না। পেটে খিদে মুখে লাজ কেন হবে? বলে দিলেই পারত সেদিন। অনন্যার মনে হচ্ছিল মাটিতে মিশে যায়। এই হয় বুঝি একটা মেয়ের জীবনে? এভাবেই আপ্যায়ন জানাতে হয় একটা নতুন বাড়িতে? সেদিনই মনে হয়েছিল ভুল করেছিল সে। এর থেকে তানিয়াকেই বরং বিয়ে করতে পারত রূপ। মানুষের রূপ দেখে প্রেমে ভেসে যাওয়ার থেকে বরং তার পরিবারের সঙ্গে থাকা দরকার আগে। বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরেও মানুষ কত পাল্টে যায়। কলকাতা আসার আগের রূপের সঙ্গে পরের রূপকে মেলাতে পারত না অনন্যা। বলতও না কিছু। নিজের পছন্দের বিয়ে। কী বলবে?

অনন্যা রুচিরাকে বলল "ভালই"।

রুচিরা হাসল " আমায় রূপ মিথ্যে বলেছিল, ওর নাকি বাবা মা দুজনেই মারা গেছে"।

অনন্যা চমকে রুচিরার দিকে তাকাল।

১১

"বিয়েটা হল মেয়েদের বোকা বানাবার প্রসেস। আসলে মেয়েরা এসেছেই পৃথিবীতে বোকা হতে। একটা বাড়িতে বেড়ে ওঠা, সেখানে নিজের ঘর বানানো। বড় হতে না হতে বিয়ে করে আরেকটা বাড়ি। কত

প্রতিশ্রুতি থাকে বল তো বিয়ের আগে। ভাবা যায় না জাস্ট। তারপর যেন আসল দুনিয়াটা সামনে আসতে শুরু করে। খেটে যাও, রান্না করে যাও সারাটাজীবন ধরে। এটাই কাজ। কি বিচ্ছিরি বল?"

ম্যাগাজিন ঘাটতে ঘাটতে রুচিরা বলল।

অনন্যা এ কথার উত্তর না দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ তুলল "তুমি চেঞ্জ করবে? লাইট কিছু পরবে? আমার থেকে নিতে পার"।

রুচিরা বলল "রূপ যখন আদর করে অন্য কোন নামে তোমায় ডেকেছে কখনও?"

অনন্যা বলল "না"।

রুচিরা বলল "তুমি তানিয়া নামটা বললে, এখন মনে পড়ল। আমায় একবার তানিয়া বলে ডেকেছিল। হু ইজ দিস তানিয়া?"

অনন্যা অবাক হলেও সামলে নিয়ে বলল "ওর এক্স"।

রুচিরা হেসে ফেলল "জানতাম এরকম কিছুই। আমি জিজ্ঞেস করায় বলেছিল ও নাকি আমাকে এই নামটা দিয়েছে। পরে কিন্তু কখনও এ নামে ডাকে নি"।

অনন্যা বলল "উইকেন্ডে অফিস আছে বলে তারমানে তোমার কাছে যেত রূপ"।

রুচিরা বলল " হ্যাঁ। আর সারাসপ্তাহ প্রচন্ড কাজের চাপ বোঝাত। সবসময় নাকি হিল্লিদিল্লি করে বেড়াতে হচ্ছে। তুমি জানো ওর জন্য আমি একটা ছেলেকে ডাম্প করেছিলাম?"

অনন্যা বলল "তুমি রূপের মধ্যে কী দেখেছিলে?"

রুচিরা বলল "সুন্দর দেখতে। ফরসা। মাথা ঘুরতে আর কী লাগে বল?"

অনন্যা বলল "আমিও তাই দেখেছিলাম"।

রুচিরা বলল "এবার ফোন কর তো। পাবে এখন। লাঞ্চের পর পাওয়া যায়। ফোন করে বাড়ি আসতে বল। কিছু একটা ছুতো কর। আমি অন্য ঘরে লুকিয়ে থাকব। আসুক। আমাকে এখানে দেখে কী করে ওর মুখটা দেখতে চাই আমি"।

অনন্যা ফোন বের করল।

১২

রূপের ফোন রিং হল এই বার। ও ফোন ধরে বলল "হ্যাঁ সোনা বল"।

রূপের " সোনা" শব্দটা যেন অনন্যার বুকে তীরের মত বিঁধল। চোখে জল চলে এল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বলল "তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসতে পারবে?"

"কেন বল তো? কী হয়েছে?"

রূপের গলা উদ্বিগ্ন।

অনন্যা বলল "এসো। বলছি"।

রূপ এবার রাগল " আরে সিরিয়াস কিছু না হলে আসব কেন? তুমি কি ভাব অফিসে আমি ইয়ার্কি মারতে আসি?"

অনন্যা রুচিরার দিকে ভ্যাবাচ্যাকা চোখে তাকাল। কী বলবে বুঝতে পারল না। রুচিরা ইশারায় বোঝাল শরীর খারাপ বলতে। অনন্যা বলল "আমার শরীর ভাল্লাগছে না"।

রূপ বলল " পাশের বাড়ির কাকুকে বল। মেডিসিন স্টোর থেকে ওষুধ নিয়ে আসবে।"

অনন্যা বলল "আমার একটু বেশিই খারাপ লাগছে রূপ"।

রূপ একটু থমকে বলল " ঠিক আছে। আসছি। তোমার খুব খারাপ লাগলে নার্সিং হোমে যেও।"

অনন্যা বলল "বুবাইকে রাখব কোথায়? তুমি এসো আগে"।

রূপ বলল " ওকে বাবা আসছি"।

ফোন কেটে গেল।

অনন্যা রুচিরাকে বলল "আসছে"।

রুচিরা হেসে তার ফোন বের করে রূপকে ফোন করল। স্পিকারে দিল ফোন। ফোন একবার রিং হতেই রূপ ধরল " হ্যাঁ বল জানু"।

রুচিরা গলায় ন্যাকামি এনে বলল "জানু, আসবে এখন? খুব একা লাগছে।"

রূপ আমতা আমতা করে বলল "আমার খুব জরুরি মিটিং পড়ে গেছে বাবু। আমি কাল যাব?"

রুচিরা অভিমান আনল "আমি এখন ওয়েট হলাম আর তুমি কাল আসবে? কাল আমি কী করব?"

রূপ একটু থেমে বলল "ওকে, আসছি জানু"।

ফোনটা কাটতেই অনন্যার ফোন বাজল। অনন্যা ধরল " হ্যালো"।

রূপ বলল " শোন না, আমি খুব জরুরি মিটিং এ ফেঁসে গেছি। তুমি বরং কাকুদের কাছে বুবাইকে রেখে নার্সিং হোমে যাও। আমি চলে যাব"।

অনন্যার চোখে জল চলে এল।

১৩

"তুমি কাঁদছো কেন? কাঁদার কিছু নেই। একটা মিথ্যা সম্পর্কের জন্য চোখের জল নষ্ট করছ কেন? আজ আমি সেক্সের জন্য রূপকে ডাকলাম বলে ও তোমাকে মিথ্যে বলল। কাল অন্য কোন মেয়ের জন্য আমাকে মিথ্যে বলবে। বা হয়ত তৃতীয় কেউ আছেও, আমি জানি না"।

অনন্যা অবাক হয়ে রুচিরার দিকে তাকাল " এরপরেও কেউ?"

রুচিরা কাঁধ ঝাঁকাল, "হতেও পারে। সব কিছু সম্ভব।ওর পিছনে একটা গোয়েন্দা লাগাব ঠিক করেছি, কী করে কোথায় যায় সব বের করব"।

অনন্যা বলল " তার দরকার হবে না। যা পারে করুক"।

রুচিরা বলল "তুমি সব এভাবে ছেড়ে দিচ্ছ কেন? এত সহজে?"

অনন্যা বলল "কী করব? আমার কি কিছু করার আছে? কাউকে জোর করে আটকানোর মধ্যে আমি নেই। বরং সব শেষ করে জীবনটাকে নতুন করে শুরু করব"।

রুচিরা বলল " তোমার রূপের কথা মনে পড়বে না?"

কলিং বেল বেজে উঠল। অনন্যা বলল "এক মিনিট"।

রুচিরা বলল "ওকে"।

অনন্যা উঠে দরজা খুলল।

একজন পুরুষকে নিয়ে অনন্যা বেডরুমে এসে রুচিরাকে বলল "ও রুহান। আমার বয়ফ্রেন্ড। রূপ যখন না থাকে..."

১৪

রুচিরা হাঁ করে অনন্যার দিকে তাকিয়ে বলল "মানে?"

অনন্যা হাসল "আমি ভাবছিলাম তুমি ওর বন্ধু নাকি, আমাকে ভয় পাওয়াতে এসেছো। পরে বুঝলাম তা নয়, তুমি সত্যিই ওর বিয়ে করা বউ। রুহানের ব্যাপারে এখন সবাই জানলেই বা কী বল। বোস রুহান"।

রুহান খানিকটা ঘাবড়েছিল রুচিরাকে দেখে। চুপ করে বসল।

অনন্যা বলল "রুহান বুবাইকে পড়ায়। এখনো কিছু করে না। একদিন নিশ্চয়ই করবে। সেদিন আমি রূপকে ছেড়ে যাব ভেবে রেখেছি"।

রুচিরা বলল "বাট ইউ আর চিটিং হিম"।

অনন্যা গম্ভীর হয়ে বুবাইকে বলল " যা ওই ঘরে কার্টুন দেখ"।

বুবাই যেতে অনন্যা রুচিরার দিকে তাকিয়ে হি হি করে হেসে বলল "আমার বর তোমার সাথে শুয়ে বেড়াবে আর আমি অন্য কারো সাথে শুলে সেটা চিটিং? মানে সিরিয়াসলি?"

রুচিরা বলল "মানে আমি জানি না কী বলব, কিন্তু সামহাউ আমার মনে হচ্ছে কাজটা তুমি ঠিক করছ না"।

অনন্যা উঠে রুহানের কোলে বসল। রুহানের মাথা বুকে জড়িয়ে রুহানের কোকড়া চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল "তুমি রূপকে নাও, এ বাড়িতে থাকো, আমার কিছু বলার নেই। রুহান রোজ আসবে, আমায় আদর করবে তুমি কিছু বলবে না। ডিল?"

রুচিরা ফ্যাল ফ্যাল করে অনন্যার দিকে তাকিয়ে বলল "দ্যাট ইজ সো রং"।

অনন্যা রুহানের কপালে চুমু খেয়ে বলল "আমার বর তোর খাট গরম করে সেটা খুব রাইট, না রে মাগী?"

রুচিরা মাথা নিচু করে বলল "শিট"।

১৫

রুহান বুবাইকে পড়াতে বসেছে ড্রয়িং রুমে।

অনন্যা ফোন বের করে রূপকে ফোন করল। রূপ ধরল না। অনন্যা ঠান্ডা গলায় রুচিরাকে বলল "ওকে ধরে দাও"।

রুচিরা নিজের ফোনটা অনন্যার দিকে এগিয়ে গেল। রিং হতে ফোন ধরেই রূপ বলল " আসছি বেবি আসছি। ট্যাক্সি নিয়েছি"।

অনন্যা বলল "আমি অনু বলছি। তোমার বেবি আমাদের বাড়ি এসছিল। এখানে চলে এসো"।

রূপের হতভম্ব গলা ভেসে এল "মানে?"

অনন্যা বলল "বাড়ি এসো। মানে বোঝাচ্ছি"।

রূপ আর কিছু বলার আগেই অনন্যা ফোনটা কেটে দিল।

রুচিরার দিকে তাকিয়ে বলল "তুমি ওকে নিয়ে আলাদা থাকতে পারো। আমার আপত্তি নেই। দেখো আমিও জানি রুহান আর আমার সম্পর্কটা শুধু শারীরিক। ও আমাকে বিয়ে করবে না। করা সম্ভবও না। আমি হাই মেন্টেনেন্স মেটিরিয়াল। তবে আইন আমার পক্ষে। আমি রূপের এডাল্টারি প্রমাণ করে দেব। পেছন মারা রূপকে নিয়ে তুমি থাকো। বাকি জীবনটা আমি খোরপোষের টাকায় আরামসে কাটিয়ে দিতে পারব। সব সময় তো সেক্সের ইচ্ছা আসে না। যখন আসবে রুহানকে ডেকে নেব। আইডিয়াটা ভাল না? আর তুমি কী ভেবেছিলে, রূপ অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াচ্ছে আমি বুঝতে পারি নি? সব বুঝেছিলাম। তবে ঘাটাইনি। ভেবেছিলাম সুতো ছাড়ি। ঘুড়ি কদ্দুর যায় দেখি। আমার কাছে ফোর নাইন্টি এইটের অস্ত্র তো আছেই। ঠিক সময় খেলে দিতে পারলে বারোটা বেজে যাবে। তুমি জল খাবে? হাল ভাল লাগছে না তোমার"।

কথাগুলো বলে অপ্রকৃতস্থর মত হাসতে শুরু করল অনন্যা।

১৬

"এই যে প্রি ওয়েডিং শ্যুট করে লোকে বিয়ের আগে, মেয়েগুলোর কী হাস্যকর দশা হয় বিয়ের পরে সেটা কেউ দেখায়? বরের বাড়িতে হেনস্থা, রান্না করা, সেক্স করতে না চাইলেও সেক্স করা, ঘর মোছা, বাসন বাজা এ সব কিছুর ভিডিও করতে পারি তো, বল?"

অনন্যা হাসি থামিয়ে রুচিরার দিকে তাকাল।

রুচিরা বলল "আমার এখানে আসা ভুল হয়েছে। সংসার দুটো আলাদা হলেই ভাল হত।"

অনন্যা জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল "একদম ঠিক করেছ। সবার সব জানা উচিত। রিলেশনস শুড বি ট্রান্সপারেন্ট। রূপ আমাদের জানাক ওর আর কোন রিলেশন আছে নাকি, আমরাও জানাই। সবাই সবকিছু এপ্রুভ করি। উই লিভ ইন এ গ্রোন আপ সোসাইটি। এখন এসব নিয়ে চাপ নিয়ে লাভ নেই"।

রুচিরা অনন্যার দিকে তাকিয়ে বলল "তোমাকে আমি এরকম ভাবি নি"।

অনন্যা আবার হাসতে হাসতে বলল "লীলাময়ী ভেবেছ? মাইরি তুমি মেয়ে না হলে তোমাকে মদন বলে ডাকতাম"।

১৭

রুহান পড়িয়ে চলে গেছিল।

রূপ এল আধ ঘন্টা পরে। অনন্যা দরজা খুলল। রূপ হতভম্ব হয়ে অনন্যার দিকে তাকিয়ে বলল "আমি জানতে পারি কী হচ্ছে এখানে?"

অনন্যা বলল "তোমার দ্বিতীয় বউ এসেছে। ও এখানেই থাকবে বলছে"।

রূপের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অনন্যার দিকে তাকিয়ে বলল " ও"।

অনন্যা বলল "তুমি চাপ নিও না। এসো, বস। কফি করছি, খাও"।

রুচিরা এসে দাঁড়িয়েছিল। রূপ ওর দিকে তাকিয়ে বলল " তুমি এখানে?"

অনন্যা বলল "ও আমাকে সারপ্রাইজ দিতে এসেছিল"।

রূপ মাথায় হাত দিয়ে সোফায় বসে বলল "আমি ভুল করেছি। অনেক বড় ভুল করেছি। আমি জানতাম এরকমই হবে। আমি এবার কী করব?"

বুবাই বাবাকে দেখে লাফাত্ব লাফাতে এসে বলল "বাবা কী এনেছ?"

রূপ প্রতিদিনই বুবাইয়ের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে। আজ তাড়াহুড়োয় ভুলে গেছে। অনন্যা মিষ্টি গলায় বুবাইকে বলল "এখন গিয়ে অংক কর। এই ঘরে এলে মেরে ঠ্যাং খোড়া করে দেব"।

বুবাই বুঝল মা রেগে আছে। অনন্যা রেগে থাকলে এরকম মিষ্টি গলাতেই কথা বলে। সে পালাল।

রূপ গেলে অনন্যা বলল " শোন রূপ, আমার ডিভোর্স লইয়ারের সাথে কথা বলাই আছে। আপাতত তোমার এগেইন্সটে একটা এডাল্টারি আনছি। বাচ্চা তো আমার কাছেই থাকবে। আমার আর বুবাইয়ের ভরণপোষণ তুমিই দেবে। তারপর ফুটোর জন্য এই মাগীর কাছে শোবে না কার কাছে গিয়ে শোবে সে ঠিক করে নিও"।

রূপ বলল,"আমায় ক্ষমা কর অনন্যা"।

অনন্যা বলল,"তানিয়ার সঙ্গে যোগাযোগটা যে তোমার এখনও আছে সেটাও আমি জানি। রুচিরাকে সেটা তুমি বলবে না আমি বলব? রুচিরা,চাইলে তুমিও রূপের এগেইন্সটে প্রতারণার মামলা করতে পার"।

রুচিরা বলল "কে তানিয়া?"

অনন্যা রূপের দিকে একবার তাকিয়ে রুচিরাকে বলল "তোমার বরের আসল নায়িকা"।

১৮

ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। রুচিরা কেঁদে ফেলল। বলল "রূপ তুমি জানো তুমি মানসিক রুগী?"

রূপ এ কথার উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল।

অনন্যা বলল "৭৩ নং বকুলবাগান লেন। সারারাত রূপ সেদিন আমার কাছে ছিল। কখন ছিল? যখন ওর সঙ্গে তানিয়ার তুমুল প্রেম। আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারি নি কখনোই। একসময় মনে হল না, শরীর যখন দিয়েছি তখন ওকে আমাকেই বিয়ে করতে হবে। তানিয়া সরল বটে কিন্তু রূপ আমার সঙ্গে বিয়ের পরেও তানিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করল আমার অজান্তেই। ও ভেবেছিল আমি কিছু জানতে পারব না। তারপর তোমার সঙ্গে। রূপ একজন মারাত্মক পারভার্ট এবং পলিগ্যামাস মানুষ। আমি কিচ্ছু বলি নি। বুবাইকে মানুষ করে গেছি আর দেখে গেছি রূপ কদ্দুর যেতে হবে। ম্যারেজ সারটিফিকেট যার থাকে তার অনেক ক্ষমতা থাকে। রূপ খুব বড় ফেঁসেছ বস। খুব বড়। তানিয়ার দেওরের নাম জানো কী রুচিরা? রুহান। রুহানকে রূপ প্ল্যান্ট করে এ বাড়িতে যাতে ওর সঙ্গে আমি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি তার জন্য। ভেবেছিল এসব দেখিয়ে আমাকে ও ডিভোর্স দেবে বা ব্ল্যাকমেইল করে বাকি সম্পর্কগুলো চালিয়ে যাবে। ও বুঝতে পারে নি ও ডালে ডালে চললেও আমিও পাতায় পাতায় চলেছি। তানিয়া এবং রুচিরার সঙ্গে সমস্ত ছবি আমার কাছে আছে রূপ। আপাতত তোমার মাইনের ৭৫% আমাকে দিও। এছাড়াও ১০ লাখ টাকা দিও। পরে কী কী লাগবে আমিই চেয়ে নেব"।

হাসতে হাসতে বলল অনন্যা।

রূপ অনন্যার পায়ে পড়ে গেল " আমাকে ক্ষমা কর প্লিজ। এত টাকা আমি কোথায় পাব?"

অনন্যা বলল "বাড়ি বেচে দাও। ওই রুচিরা বা তানিয়া ডাইনির বাড়ি গিয়ে থাকো। আমার ছেঁড়া যায় তোমার কী হবে সেটা ভাবতে"।

বুবাই কোত্থেকে এ ঘরে এসে বলল " ছেঁড়া যায় মানে কী বাবা?"

১৯

অনন্যা রূপকে বলল "পলিগ্যামি ভাল না খারাপ, সে তর্কে আমি যাব না। আমার বয়স কম ছিল, আমি তোমার সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কেউ সহজলভ্য হলেই যে তোমাকেও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে, এটাই বা তুমি কি করে ভাবলে? নিজের বউকে অন্য কারো সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে ভাবলে তুমি যা খুশি করে বেড়াবে? একবারও ভাবলে না বুবাইয়ের কথা?"

রূপ অনন্যার দিকে তাকিয়ে বলল "শোন, আমি তোমায় খোরপোষ বাবদ যা লাগে দেব, তবে ওত টাকা ডিমান্ড কোর না, এতটাকা দিলে আমি নিজে কী খাব?"

অনন্যা বলল "খাবে না। না খেয়ে থাকলে আশা করি তোমার উত্থিত পুরুষাঙ্গ খানিকটা ঠান্ডা হবে। কী ভেবেছিলে তুমি? এভাবেই সারাজীবন চলে যাবে? আর কেউ কিছু বুঝতে পারবে না?"

রূচিরা এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। এবার বলল "আমি কোথায় যাব?"

অনন্যা বলল "তুমি তো ওর বউ বাচ্চা আছে জেনেও ওকে বিয়ে করে এ বাড়িতে মজা দেখতে এসেছিলে! তুমি কী করবে আমি কেন বলব বল?"

রুচিরা বলল "আমিও তো প্রতারিত"।

অনন্যা বলল "তো? আচ্ছা শোন রূপ, আধঘন্টা সময় দিলাম। এই মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। আমার একাউন্ট নাম্বার তোমার কাছে আছে। টাকা পাঠিয়ে দেবে মাসের শুরুতেই নইলে কিন্তু আমি বুঝে নেব"।

রূপ বলল "কোথায় যাব আমি?"

অনন্যা বলল "বাকিদের সঙ্গে প্রেম করার সময় আমায় জিজ্ঞেস করে করেছিলে? তাহলে এখন কেন জিজ্ঞেস করছ?"

রুচিরা বলল "ভুলেও আমার বাড়িতে আসার কথা ভেবো না রূপ। ওখানেও তোমার জন্য কোন লাল কার্পেট রাখা নেই"।

রূপ কয়েক সেকেন্ড বসে দাঁড়াল। অনন্যা এবং রুচিরার দিকে একবার করে তাকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

২০

রূপ বেরিয়ে যেতে রুচিরা কাঁদছিল। অনন্যা ওর দিকে তাকিয়ে বলল "বাড়ি যাও"।

রুচিরা বলল " আমার সব শেষ হয়ে গেল"।

অনন্যা বলল "আমার সব শুরু হল বুঝি?"

বুবাই খেলছিল নিজের মনে। অনন্যাকে বলল "মা আজ বিরিয়ানি খাব"।

অনন্যা মনে মনে বলল " হ্যাঁ তোর বাবার আবার বিয়ে লেগেছে বিরিয়ানিই তো খাবি"।

মুখে বলল "পড়তে বস বায়না না করে"।

রুচিরা বলল "আমি রূপকে দেখে কখনোই বুঝি নি ও এরকম"।

অনন্যা বলল "কাকে দেখে বোঝা যায়? কোন পুরুষকে? যে মানুষ সামনে একরকম, মুখ ফিরলে তারাই অন্যরকম। আমার পাশের বাড়ি এক কাকু ছিল, একদিন পাড়া থেকে পিকনিক ছেড়েছিল। ফেরার সময় বাস অন্ধকারে খারাপ হয়ে গেল। কাকুটা হঠাৎ কোত্থেকে এসে অন্ধকারে আমার বুকে হাত দিয়েছিল। আতঙ্কে আমি কোন কথা বলতে পারি নি। ওর দুই মেয়ে আমার সঙ্গে পড়ত। কাউকে বলতে পারি নি উনি এরকম করেছিলেন। আমাদের প্রত্যেক মেয়ের জীবনেই এরকম চেপে রাখা, চমকে দেওয়া অনেক অনেক গল্প আছে। তুমিও ভেবে নিও, রূপ এরকম কেউ ছিল। তবে ছেড়ো না ওকে। ওকে ছাড়লে কিন্তু ও আবার অন্য কারো জীবন নষ্ট করবেই। যে পুরুষ বহু নারীর স্বাদ পেয়ে যায়, সে অনেকটা নরখাদকের মত হয়ে যায়"।

রুচিরা বলল " আমি ওর জন্য যে ছেলেটাকে ডাম্প করেছিলাম তাকে ফোন করব? ফিরে যাব ওর কাছে?"

অনন্যা বলল "ক্ষমা চাও। দেখো কী বলে"।

রুচিরা বলল " ও এখনও আমাকে মেসেজ করে। ভালবাসে আমি বুঝি"।

অনন্যা শব্দ করে হেসে বলল "ভালবাসে না, বাল বাসে।আর কাউকে জুটাতে পারে নি তাই তোমার কাছে আসতে চায়"।

রুচিরা মাথা নিচু করে বলল " আমি যাই। আর কোন দিন আসব না। ভেঙে গেলাম বড্ড"।

অনন্যা উঠে দরজা খুলে দিয়ে বলল "হু, এসো। আশা করি আর কোন দিন আসবে না। মনে রেখো আমি তোমাকে দেখতে পারব না কোন দিন"।

রুচিরা মাথা নিচু করে বলল "সরি। ক্ষমা করে দিও। আসি"।

বেরিয়ে গেল রুচিরা।

অনন্যা রান্না বসাল। মাংস। ঝাল ঝাল করে।

আধ ঘন্টা পরে কলিং বেল বাজল।

অনন্যা দরজা খুলে দেখল রূপ দাঁড়িয়ে।

বেশ খানিকক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দুজনেই হেসে দিল।

রূপ বলল "উফ রুচিরা মেয়েটাকে গলা নামাতে দম বেরিয়ে যাচ্ছিল। গলায় ফাঁস হয়ে গেছিল পুরো। বাঁচলাম আজ।"

অনন্যা মুখ বেকিয়ে বলল "কপাল ভাল যে আমার মত বউ পেয়েছিলে যে তোমাকে এসব থেকে বাঁচায়। আমার যা রূপ দেখেছে তাতে আর জীবনেও এ দিকে ফিরবে না"।

রূপ বলল " মাথা খারাপ মেয়েটার। বউ আছে জানার পর থেকেই ঝামেলা করছিল। আমি জানতাম ও আজ কালের মধ্যেই আসবে। ম্যানেজ দিয়ে বাঁচালে"।

অনন্যা বলল "ওর গয়নাগুলো তোমার কাছেই রাখা তো? আমাকে দিও কাল, ডিজাইন পছন্দ হলে সেগুলোই পরব নইলে চেঞ্জ করব"।

রূপ অনন্যার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল "তোমার রুহান থাক, আমার তানিয়া, মাঝে মাঝে রুচিরার মত দু চারটে কেচ্ছা করলে এভাবেই সামলে নিও মাইরি"।

অনন্যা মুচকি হেসে বলল "একদম"।

দ্বিতীয় পুরুষ

১

“আমার সমুদ্র ভাল লাগে না”।

অদিতি ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল।

তীর্থঙ্কর বলল “আগে বলতে পারতে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম”।

অদিতি তীর্থঙ্করের দিকে তাকিয়ে হাসল “আমি যে বিয়ে করব, আমার যে কোন দিন হানিমুন হবে, আমি সেটাই ঠিক করে ভাবি নি জানো তো। গোটা ব্যাপারটার জন্য আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না”।

তীর্থ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল “চা খাবে?”

অদিতি বলল “কফি খেতে ইচ্ছা করছে, এখানে পাওয়া যাবে?”

তীর্থ চেয়ার থেকে উঠে বলল “আমি দেখছি”।

অদিতি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকল।

কয়েক মিনিট পরে তীর্থ হাতে দুটো কাপ নিয়ে এসে একটা কাপ অদিতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল “এই নাও। পেলাম”।

অদিতি কাপটা নিয়ে কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল “আমি তোমাকে বড় বিড়ম্বনায় ফেলছি বল? বিয়ের পরও স্বামী স্ত্রী হয়ে থাকতে পারছি না আমরা। তুমি কি ডিভোর্স ফাইল করবে?”

তীর্থ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল “আমাদের বাড়িতে আসলে কোন দিন এসব হয় নি। বললেও অনেক ঝামেলা হতে পারে। যেভাবে আছো, খুব অসুবিধা না হলে এভাবে থাকো। তারপরে না হয় দেখা যাবে কোন দিন”।

অদিতি বলল “ডিভোর্স আমাদের বাড়ির দিকেও তেমন কারও হয় নি। তবে তোমার মনে হতেই পারে আমি ঠকিয়েছি”।

তীর্থ হেসে বলল “নাহ। ঠকানোর কিছু নেই। সম্পর্ক এরকম হয় তো। বিষহীন। আচ্ছা, একটা শব্দ মনে পড়ল, অসমুদ্র। কেমন শব্দটা?”

অদিতি অবাক হয়ে বলল “আসমুদ্র?”

তীর্থ বলল “না, অসমুদ্র। মানে হল সমুদ্রের মত নয়। ঢেউহীন, নিস্তরঙ্গ”।

অদিতি বলল “ভাল শব্দ তো। এটা তুমি আমাদের রিলেশনকে ডিফাইন করতে ব্যবহার করতে চাও তাই তো?”

তীর্থ বলল “হ্যাঁ। শারীরিক সম্পর্কহীন অথচ আপোষে থাকা একটা জীবন। কেউ কারও পথে আসবে না। মন্দ কি?”

অদিতি বলল “মন্দ না। আচ্ছা তোমার হঠাৎ করে আমায় পছন্দ হয়েছিল কেন? আমি তো সাজিই নি বলতে গেলে”।

তীর্থ বলল “সাজো নি বলেই হয়ত। চিরকাল তো বিয়ে করব না ঠিক করেই চলছিলাম। বাড়ি থেকে এমন চাপ দিতে শুরু করেছিল, তিতিবিরক্ত হয়ে রাজি হয়ে গেলাম। প্রথম সম্বন্ধটাতেই তোমাকে দেখা। মেক আপ হীন ঠান্ডা মুখ চোখ। আবার বলেও দিলে আমাকে কোন দিন ভালবাসতে পারবে না। কেন জানি

না, এসবই টানল। অতি ভালবাসাও কখনও বিরক্তির কারণ হয়ে যায়। আমি তোমার মত কাউকেই চেয়েছিলাম হয়ত যে ভাল বাসবে না। লোকেও জানবে এরা বিবাহিত"।

অদিতি বলল "তোমার ভালবাসার প্রতি আসক্তি নেই বা বিরক্তি কেন এত? কেউ ছিল নাকি?"

তীর্থ বলল "না। কেউ ছিল না। আমি একজন অত্যন্ত সেলফ সেন্টারড সেলফিস প্রকৃতির মানুষ। নিজেকে ভালবাসি। আমার পক্ষে দ্বিতীয় কাউকে ভালবাসা সম্ভব না সেটা বুঝি"।

অদিতি বলল "তাহলে কফিটা আনতে গিয়ে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছো?"

তীর্থ হাসল, "না। বরং খানিকটা হাঁফ ছেড়েছি। মাঝে মাঝে তোমাকে বড্ড দূরের কেউ বলে মনে হয় আমার। প্রেমে এত ব্যথা মনে হয় দেবদাসও পায় নি"।

অদিতি গম্ভীর হয়ে গেল "মজা করছ?"

তীর্থ বলল "না। মজা করব এত ধৃষ্টতা আমার নেই। তোমাকে আমি সম্মান করি। তুমি তো কিছু লুকিয়ে বিয়েটা কর নি। সাগ্নিক তোমাকে ডিচ করেছিল, তারপর থেকে তুমি কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারবে না, দ্যাটস কুল। আমিও তোমাকে বিয়ে করব কিন্তু ভালবাসতে পারব না এটাও তো ঠিক"।

এক পরিবার তাদের পাশের চেয়ারগুলো দখল করে হৈ হৈ শুরু করল।

অদিতি বলল "হোটেলে চল"।

তীর্থ উঠল "চল। তোমাকে দিয়ে এসে আমি আবার এসে বসব। আমার ভাল লাগছে সমুদ্রের তীরের হাওয়াটা"।

অদিতি বলল "তাহলে তুমি বস। আমি চলে যেতে পারব"।

তীর্থ বলল "নাহ। বীচের এই দিকটা ঠিক সুবিধের না। তুমি এগোও না। আমি একটু দেখেই ফিরে আসব"।

অদিতি একটু ভেবে নিয়ে বলল "বেশ। আচ্ছা, এটা কি বিরক্তি থেকে করবে?"

তীর্থ বলল "না, খুব সেলফিস মানুষেরও কিছু রেসপন্সিবিলিটি থাকে। এটা সেরকম কিছুই ভেবে নাও"।

অদিতি বলল "আচ্ছা"।

দুজনে হাঁটতে শুরু করল।

সন্ধ্যে বেলা। পুরীর সমুদ্রতটের এই অঞ্চলটায় খুব বেশি লোক বসতি নেই। হোটেল থাকলেও মানুষ কম। সিজন না এখন।

তীর্থ বলল "সাগ্নিক ছেলেটাকে আমার বড্ড দেখার ইচ্ছা জানো! একটা ছেলে গোটা পুরুষ সমাজের প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলল, ভারি ইন্টারেস্টিং কিন্তু"।

অদিতি বলল "দয়া করে সেই চ্যাপ্টারটা আমাকে মনে না করালে খুশি হব"।

তীর্থ জিভ কাটল "আন্তরিকভাবে দুঃখিত"।

অদিতি বলল "হানিমুন না কী যেন বলে, এসব আর যাই হোক, বাড়ির ভিড়টা থেকে পালাতে সাহায্য করে। তোমার বাড়ির লোকজন ভারি ইয়ে। বিশেষ করে তোমার বউদিরা। আমাকে কেবল জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে ফুলশয্যায় সব ঠিক ছিল তো? মানুষের মাথা এত সেক্স ওরিয়েন্টেড হবে কেন? সেক্স ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন জিনিস নেই বুঝি?"

তীর্থ বলল "এরা অনেক ভাল। আমার এক বন্ধুর মা কাকীমারা বিছানার চাদর চেক করেছিল"।

অদিতি মুখ বিকৃত করে বলল "সিক পিপল এভ্রিহোয়ার"।

তীর্থ বলল "সিক নাকি জানি না, তবে এসব কৌতূহল খুব অস্বাভাবিক বলে আমার মনে হয় না। মানুষের বরাবরই অপরজনের বেডরুমের কাহিনি জানার আগ্রহটা বেশি"।

অদিতি বলল "কই, আমার তো সে আগ্রহ নেই"!

তীর্থ বলল "ব্যতিক্রম সব জায়গাতেই থাকে। আমারও আগ্রহ জিনিসটা কম, নইলে অনেক আগেই জিজ্ঞেস করতে পারতাম তোমার সঙ্গে সাগ্নিকের শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল কিনা"।

অদিতি হাঁটছিল। থেমে গিয়ে বলল "এটা তোমার মনের মধ্যে ছিল। বেশ তো, জানতে চাইছো যখন জেনে নাও। ছিল। বেশ ভাল মতই ছিল"।

তীর্থ বলল "বেশ তো। মিটে গেল। একবারেই যে কৌতূহল ছিল না, তা নয়"।

অদিতি বলল "তো ডোন্ট অ্যাক্ট স্মার্ট না! কৌতূহল সবার থাকে"।

তীর্থ অপরাধীর মত মুখ করে চুপ করে গেল।

অদিতি খানিকটা বিরক্ত হয়েই এগিয়ে গেল।

তীর্থ দাঁড়িয়ে পড়ল।

অদিতিকে হোটেলের ভিতর যেতে দেখে ঘুরে গিয়ে বীচের দিকে রওনা দিল।

২

রাত ন'টা নাগাদ ফিরল তীর্থ।

অদিতি টিভি দেখছিল। রুমের বেল বাজতে দরজা খুলে বলল "আমি ভেবেছিলাম ডিনার এসেছে। বড় দেরী করছে ডিনার দিতে"।

তীর্থ বলল "সাড়ে ন'টায় দেবে বলল রিসেপশনে। আমি কি বলে দেব এখনই দিয়ে দিতে? তোমার খিদে পেয়েছে?"

অদিতি বলল "নাহ্। দিক তখনই। তুমি এতক্ষণ কি সি বীচেই বসে ছিলে?"

তীর্থ বলল "হ্যাঁ। কোথায় আর যাব? একবার ভাবলাম বটে খাজা খেতে স্বর্গোদ্বারের দিকে যাব, শেষমেশ আর গেলাম না। অমলেট খেলাম একটা। ঠিক পরিষ্কারও না দোকানটা। কেমন বালি বালি। তবু গরম অমলেট ভালই লাগল"।

অদিতি টিভির দিকে তাকিয়ে বলল "ও, তুমি খেয়ে এসেছো! এদিকে আমি একবার পকোড়া খাব বলেও খেলাম না"।

তীর্থ অপরাধীর মত মুখ করে বলল "সেটা আগে বলতে পারতে যে খাবে"।

অদিতি বলল "ঠিক আছে। চিন্তা কোর না। তুমি পা ধুয়ে নাও। ঘরময় বালি কিচকিচ করে। এই জন্য সমুদ্র আরও ভাল লাগে না আমার। একটা টাওয়াল পাপোষ হিসেবে ইউজ করতে হবে। তাহলে অতটা সমস্যা হবে না"।

তীর্থ বলল "হ্যাঁ, আমি পা ধুয়ে নি"।

বাথরুমে ঢুকল তীর্থ। অদিতি মিউজিক চ্যানেল দিল।

বলিউডি গান হচ্ছে।

কয়েক মিনিট পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে তীর্থ সোফায় বসল।

অদিতি বলল "ডিনারে চিকেন বলা ছিল না? তার সঙ্গে একটা অমলেট বলে দিও"।

তীর্থ বলল "ঠিক আছে"।

রিসেপশনে ফোন করে তীর্থ অমলেট বলে দিয়ে বলল তাড়াতাড়ি তাদের ডিনার দিয়ে দিতে।

সে ফোন রাখতে অদিতি টিভিটা মিউট করে বলল "তোমার হঠাৎ সাগ্নিকের সঙ্গে আমার ফিজিকাল রিলেশন নিয়ে জানতে ইচ্ছে হল কেন?"

তীর্থ বলল "আমি তো তোমাকে সরি বলেছি। আমি কোন কিছু ভেবে প্রশ্নটা করি নি। এমনি বলে ফেলেছি"।

অদিতি তীর্থর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল "একটা মানুষ সম্পর্কে থাকাকালীন ফিজিকাল রিলেশনশিপে যেতেই পারে। সেটা তাদের মিউচুয়াল ডিসিশনে হয়। এখানে কারও কিছু বলার থাকে না। আমি সাগ্নিকের সঙ্গে বিয়ে করবই ভেবে সব কিছু করি নি। তবু ও আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় আমার খারাপ লেগেছে। ক্লিয়ার করতে পারলাম কিছুটা?"

তীর্থ থতমত হয়ে বলল "আচ্ছা, থাক না। এসব বিষয়..."

অদিতি বলল "আমার তোমাকে সব বলার দায় নেই যদিও। তবু বলে দিলাম। শরীর নিয়ে আমার অপরাধবোধ নেই। ভুল মানুষকে ভালবেসেছিলাম বলে আছে। আমি আর কাউকে ভাল বাসতে পারব না। এসব ব্যাপারে আমার মেন্টাল রিজিডিটি আছে খানিকটা"।

তীর্থ বলল "তুমি যে বলছ আর কাউকে ভালবাসতে পারবে না, এটার একটা মানে দাঁড়ায়, সেটা হল সাগ্নিককে তুমি এখনও ভালবাসো"।

অদিতির চোয়াল শক্ত হল "না। সাগ্নিককে আমি ভালবাসি না এখন। ভালবাসা শব্দটাই আমার কাছে একটা তিক্ত শব্দ হয়ে গেছে। এই লেবুটা আমি আর কচলাতে চাই না"।

তীর্থ হেসে বলল "ভাল ব্যাপার। ভালবাসা জিনিসটা আমিও বিশ্বাস করি না। হস্টেলে থাকাকালীন দেখেছি ছেলেপুলে রাত জেগে ফোন করে যেত। একদিন মন দিয়ে শুনতে গেছিলাম তারা কী কথা বলে। কী এমন কথা যার জন্য কেউ রাতের ঘুম অবধি বিসর্জন দিয়ে দেয়। শুনতে গিয়ে দেখা গেল এ প্রান্তের ছেলেটা রাত আড়াইটার সময় গ্যাদা পাতা কেন কাটা জায়গায় দিতে হয়, তা নিয়ে ভাষণ দিচ্ছে। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম সিরিয়াসলি? রাত আড়াইটায় গ্যাদা পাতা? এই যে তুমি আমায় জানিয়ে দিয়েছো তুমি আমায় কোন দিন ভালবাসতে পারবে না, এই ব্যাপারটায় আমি বেশ খুশি হয়েছি। নইলে রাত আড়াইটায় জেগে থেকে যদি কোন দিন তোমার সঙ্গে এইসব আলোচনা করতে হত ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য, ব্যাপারটা আমার পক্ষে মোটেই সুখকর হত না"।

অদিতি বলল "সবাই গ্যাদা পাতা নিয়ে আলোচনা নাও করতে পারে। ইন ফ্যাক্ট আমি করি নি কোন দিন"।

তীর্থ বলল "কী নিয়ে করতে?"

অদিতি বলল "সাহিত্য নিয়ে। গান নিয়ে। সিনেমা নিয়েও করেছি। সাগ্নিকের পড়াশুনা ভাল। অনেক কিছু জানে। ওর সঙ্গে এসব ব্যাপারে কথা বলতে ভাল লাগত"।

তীর্থ বলল "এই ব্যাপারে আমি তোমাকে হতাশ করতাম। প্রথাগত পড়াশুনার বাইরে তেমন কিছু পড়ি নি। অবশ্য বাইরের বই একবারে পড়ি নি তাও না। ট্রেনে চাপলে যেমন আমি মেন্ডেটারি হাঁদা ভোদা কিনি। একটা কমিক্স মনে পড়ল, হাঁদা একটা ছিপি বন্দুক আর পিসেমশাই একটা এয়ারগান নিয়ে পাখি শিকারে গেছে। পিসেমশাই এয়ারগান দিয়ে পাখির দিকে গুলি ছোড়ার আগেই হাঁদার ছিপি বন্দুক থেকে বেরনো ছিপি পিসেমশাইয়ের টাকে গিয়ে লাগল। সেটা দেখে টানা দশ মিনিট আমি ট্রেনের মধ্যে হেসেছিলাম। লোক জন আমায় পাগল ভেবেছিল"।

অদিতি বলল "অথবা ভেবেছিল তোমার এখনও অ্যাডোলেসেন্স কাটে নি"।

তীর্থ খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলল "তা হবে। আমি সাগ্নিকের মত অতটা চৌখশ নই। উল্টোটাই বলতে পারো। এমনকি আমায় চীপ বললেও আমি সেটা খুব একটা অস্বীকার করব না। মিসোজিনিস্ট জোক্সে আমি

হাসি। বিলো দ্য বেল্ট ডার্ক জোকসেও। আমার মধ্যে সেনসিটিভ ব্যাপারটাও কম আছে। আমি তো তোমাকে বলেইছি আমি সেলফিস"।

অদিতি বলল "সেটা তোমার অমলেট খাওয়া দেখেই আমি বুঝেছি"।

তীর্থ বলল "তা ঠিক"।

কলিং বেল বেজে উঠল। তীর্থ উঠে বলল "ডিনার এসে গেছে। দরজা খুলি"।

তীর্থ উঠে দরজা খুলল। হোটেলের বয় ডিনার রেখে চলে গেল। রুটি মাংস, একটা অমলেট।

অদিতি তীর্থ খাবার ভাগ করে দিল। অদিতি নিজের প্লেট নিয়ে খেতে খেতে বলল "তুমি চাইলে আমার থেকে অমলেট নিতে পারো"।

তীর্থ বলল "না না, দরকার নেই"।

অদিতি বলল "নেব বললে যেন কত দিতাম!"

তীর্থ বলল "তুমি কি আমার অমলেট খাওয়া নিয়ে ভীষণ রেগে আছো?"

অদিতি বলল "তা আছি। তবে রাগারাগি তো রিয়েল রিলেশনশিপে হয়। আমার জীবনে সেটা আর হবে না বলে আমি ঠিক করে নিয়েছি। তাই আর রাগারাগি করা বোধ হয় ঠিক হবে না। তাই না?"

তীর্থ রুটিতে মাংসের ঝোল মাখিয়ে খেতে খেতে বলল "তা হবে। আমার আবার আবেগ জিনিসটাই নেই। তুমি ভালবাসলেও আমি বুঝতে পারব না"।

অদিতি বলল "কিউট হানিমুন তাই না?"

তীর্থ হেসে বলল "ঢপের হানিমুন। এটাই ভাল। আমাদের দুজনের জন্যই"।

৩

"কোথাও একটা পড়েছিলাম যে সম্পর্কে তুমুক ঝগড়া হয় না, সে দাম্পত্য নাকি টেকেই না"।

খাওয়া হয়ে গেছে। ব্যালকনিতে চেয়ার নিয়ে বসেছে দুজন। তীর্থ কথাটা বলে অদিতির দিকে তাকাল।

অদিতি বলল "কথাটা ভুল কিছু না। আবার যে রিলেশনে এক পক্ষকে অতিরিক্ত কম্প্রোমাইজ করতে হয়, সে সম্পর্কও বেশিদিন টেকে না। বেশিরভাগ মেয়েকেই বিয়ের পরে গান, নাচ, জিন্স পরা সব ছেড়ে দিতে হয় শ্বশুরবাড়ির চাপে পড়ে। ছেলেপক্ষ ভেবে নেয় ভারি জিতলাম। মেয়ে কিন্তু ভোলে না। ধীরে ধীরে সংসারে তার হাত শক্ত হলেই তার প্রতিশোধ নিতে শুরু করে অন্যভাবে। বরকে বলে নেশা কোর না, এ কোর না, সে কোর না। দিন সবার আসে। কখনও আগে আসে, কখনও পরে"।

তীর্থ বলল "সম্পর্ক নিয়ে তোমার বেশ ভাল জ্ঞান আছে দেখছি। ইম্প্রেসিভ"।

অদিতি বলল "বেশিরভাগ মেয়েরাই এসব ব্যাপারে ছেলেদের থেকে বেশি জানে। অথবা ছেলেরা মেয়েদের এইসব ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় নি বলেই কম জানে হয়ত। তুমি যেমন সম্পর্ক জিনিসটাই চাও নি কোন দিন সেভাবে। বাড়ির চাপে পড়ে আমার সঙ্গে একটা খেলা খেলা টাইপ বিয়ে করেছো। গোটা ব্যাপারটাই ক্যালকুলেটিভ। বেশিরভাগ পুরুষই তাই। নিজের কাজ মিটে গেলে আর কোন কিছু নিয়ে তাদের আগ্রহ থাকে না"।

তীর্থ বলল "আমার মনে হয় তুমি লেসবিয়ান হয়ে যাবে দুদিন পরে। এত পুরুষ বিদ্বেষ আর সরলীকরণ বিরক্তিকর লাগছে"।

অদিতি বলল "হুহ। সে নিজেদের সম্পর্কে সত্যিটা শুনলে হবেই এরকম"।

তীর্থ খানিকটা তেরিয়া হয়ে বলল "মেয়েরাও কত ভাল আমার জানা আছে। ইউনিভার্সিটিতে যেন আমি দেখি নি প্রফেসরকে একটু ঠেকিয়ে কত মেয়ে কত কিছু হাসিল করে নিচ্ছে!"

অদিতি বলল "তা ঐ প্রফেসরও তো পুরুষ! নিজের চরিত্র ঠিক রাখল না কেন?"

তীর্থ বলল "মেয়েগুলোই বা ওরকম যাবে কেন? কোন পক্ষই ধোয়া তুলসীপাতা না বুঝলে? তোমার আর সাগ্নিকের মধ্যে ঝামেলা না? দেখা যাবে তোমারও দোষ ছিল। নিশ্চয়ই ন্যাগিং গার্লফ্রেন্ড ছিলে। পজেসিভও হতে পারো। সন্দেহবাতিক হতে পারো। কে দেখতে যাচ্ছে?"

অদিতি বলল "ন্যাগিং? আমি? ওসব আমার মধ্যে নেই। আর জীবনে ওর মোবাইল ছুইও নি। বুঝলে?"

তীর্থ বলল "কেন ছুঁতে হবে? মোবাইল ছুঁতে হবে কেন? প্রতিটা মানুষের প্রাইভেসী আছে"।

অদিতি বলল "না তুমি বললে না সন্দেহবাতিকের কথা। তাই বললাম। আমার ওসব নেই। একেবারেই ছিল না। বরং এখন মনে হয় খানিকটা সন্দেহবাতিক প্রতিটা মহিলার হওয়া উচিত। বরের মোবাইলও ঘাঁটা উচিত নিয়ম করে। পুরুষ মাত্রেই বহুগামী!"

তীর্থ বলল "ওই যে, ঘুরে ফিরে বন্দেমাতরম। তোমার সব কথার শেষে একটা কানাগলি চলে আসে। পুরুষ বিদ্বেষ। দেখো অদিতি, হতে পারে সাগ্নিক তোমাকে ডিচ করেছে, কিন্তু এরকম অন্ধ হয়ে থাকাটা কোন কাজের কথা না। নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে বরং চেষ্টা কর সবার পজিটিভ জিনিসটা দেখতে"।

অদিতি বলল "কীভাবে দেখব কারও পজিটিভ জিনিস?"

তীর্থ বলল "কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে। তোমার জন্য বরং একটা ছেলে দেখি চল। ভাল দেখে একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম কর। তারপর পালিয়ে যাও। বেশ একটা থ্রিলিং ব্যাপার হবে"।

অদিতি একটা হাই তুলে বলল "তুমি একটা জিনিস জানো?"

তীর্থ বলল "কী?"

অদিতি বলল "তুমি মানসিক ভারসাম্যহীন?"

তীর্থ বলল "মানে?"

অদিতি বলল "মানে তুমি কী বলছ, কাকে বলছ, সে সম্পর্কে তোমার নিজেরই কোন ধারণা নেই। আচ্ছা, তুমি জীবনেও কন্ডোম কিনেছো?"

তীর্থ অবাক হল "মানে? কেন কন্ডোম কিনতে যাব?"

অদিতি বলল "এই তো। ভাল ছেলে থেকে গেছো সারা জীবন। মাস্টারবেটও কর না বোধ হয় তাই না? নিশ্চয়ই নাইট ফলস হয়ে যায়?"

তীর্থ এবার রাগল "এসব কী কথা? কেন মাস্টারবেট করব না? ওটা না করলে তোমার সঙ্গে এক ঘরে থাকি কী করে?"

অদিতি বলল "আচ্ছা? আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাবার পর বা এক বিছানায় থাকার পর তোমাকে মাস্টারবেট করতে হয় বুঝি?"

তীর্থ বলল "কেন করতে হবে না? আমি স্বাভাবিক পুরুষ মানুষ। আমার সমস্ত অনুভূতিই ন্যাচারাল"।

অদিতি বলল "ওকে। এবার তুমি পরস্পরবিরোধী কথা বলছ। একবার বলেছ তুমি সম্পর্কে জড়াতে চাইছ না, আবার আমাকে দেখে তোমাকে মাস্টারবেটও করতে হচ্ছে"।

তীর্থ বলল "মাস্টারবেটটা তো শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। আমাকে করতেই হবে। এটা করলে আমার মনে হয় বেশিরভাগ পুরুষের চরিত্রই ভাল থাকত। আমার তো মনে হয় প্রতিটা পুরুষকে স্কুলে মাস্টারবেট করা শেখানো উচিত ঠিক করে যাতে দেশে রেপ কমে যায়"।

অদিতি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল "নট এ ব্যাড আইডিয়া, আই মাস্ট সে। চল দেখি, এক প্যাকেট কন্ডোম কিনবে। দেখি কীভাবে কেনো। চল। ওই তো সামনেই ওষুধের দোকান আছে। কিনবে চল"।

তীর্থ বলল "বেশ তো কিনবো। কিনে কী করব? বেলুন ফুলাবো? তোমার সঙ্গে তো কিছু হবে না আমার। আমাদের বিয়ের চুক্তিতে ফিজিকাল রিলেশনশিপ নেই। তাহলে খামোখা কিনতে যাব কেন?"

অদিতি বলল "কারণ কন্ডোম, ন্যাপকিন, কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল এসব হল একজন পুরুষের বড় হবার প্রাথমিক ধাপ। তুমি আজ কন্ডোম দিয়ে শুরু কর"।

তীর্থ বলল "পারলাম না। এবং দয়া করে আমাকে ইন্সট্রাকশন দেওয়া বন্ধ কর। আমাকে কেউ ইন্সট্রাকশন দিক এটা আমি পছন্দ করি না। এজন্যই আমি বিয়ে করতে চাইতাম না"।

অদিতি বলল "ওহ। ভয় পেলে?"

তীর্থ রেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলল "ভয় পাবার কী আছে? ওয়েট কর আমি এখনই কিনে আনছি"।

ঝড়ের গতিতে তীর্থ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিছুক্ষণ পর এক প্যাকেট কন্ডোম নিয়ে এসে অদিতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল "নাও, কী করবে কর"।

অদিতি প্যাকেটটা হাতে নিয়ে মোবাইলের আলো প্যাকেটের ওপর ফেলে বলল "চকোলেট ফ্লেবার এনেছো দেখছি। আচ্ছা বল তো কন্ডোমে ফ্লেবার কী কাজে লাগে?"

তীর্থ বলল "আমি কী করে জানব?"

অদিতি বলল "আমার বিয়ার খেতে ইচ্ছা করছে। দোকান খোলা আছে? আমি দেখব?"

তীর্থ বলল "বন্ধ হয়ে গেছে মনে হয়"।

অদিতি বলল "দেখে আসি"।

তীর্থ বলল "তোমাকে যেতে হবে না। আমিই যাচ্ছি। পুরুষ হয়েছি। কী করে একজন মেয়েকে একা ছাড়ব?"

অদিতি বলল "বাবা! কত পুরুষ এলেন আমার! একা একা অমলেট খায় হানিমুনে এসে। হাহ!"

তীর্থ বলল "হানিমুন কোথায়? সব তো সাজানো ঘটনা"!

অদিতি বলল "তা বটে। ঠিক আছে, তোমাকে একা যেতে হবে না, আমিও যাব চল"।

তীর্থ বলল "কন্ডোমের প্যাকেটটা কী করব?"

অদিতি বলল "বেলুন ফুলাও। বললে তো!"

তীর্থ ব্যালকনি থেকে বাইরের দিকে প্যাকেটটা ফেলে দিল।

অদিতি হা হা করে বলল "ফেলে দিলে কেন? টাকা দিয়ে কেনো নি? কাউকে দিয়ে দিতে?"

তীর্থ বলল "কাকে দেবো? আর দিতে যাবই বা কেন? আজব!"

অদিতি ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল "আচ্ছা চল। বিয়ার কিনে আনা যাক"।

৪

"তোমার আমার কেসটা বেশ ইন্টারেস্টিং কিন্তু। একটা সেলফ সেন্টারড কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড ছেলে, আর একটা প্রেমে দাগা খাওয়া সম্পর্কে অবিশ্বাসী মেয়ে"।

বিয়ারের বোতলে চুমুক দিয়ে বলল অদিতি।

তীর্থ টিভি দেখছিল। সেদিকে তাকিয়েই বলল "বার বার আমার চরিত্রে হাত না দিলে চলছে না? আমি সেলফিস সেটা আমি জানি। বার বার বোল না তা বলে। আমারও ভাল লাগে না"।

অদিতি বলল "হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে। বিয়ার পেটে পড়লে আমার একটু ভাট বকা অভ্যাস হয়। তুমি খাচ্ছ না কেন?"

তীর্থ বলল "ও আমি খাব না, খেলেই বমি হয়"।

অদিতি বলল "ছ্যা ছ্যা ছ্যা। লজ্জা। সামান্য বিয়ার নিতে পারো না?"

তীর্থ বলল "না, নিতে পারি না। কী করব?"

অদিতি বলল "তুমি না ভীষণ লালু ভুলু ভাবে মানুষ হয়েছো। এই জন্য এরকম হয়ে গেছো"।

তীর্থ বলল "কী করব?ছোট থেকেই বাবা মা চাকরিতে বেরিয়ে যেত। একা একা মানুষ। প্রথম প্রথম অসহ্য লাগত, তারপর দেখলাম উল্টো ব্যাপার। মানুষ সহ্য হয় না। একা থাকতেই ভাল লাগে। কখনও আমার কথা বলতেও ইচ্ছা করে না। তোমাকে আগে থেকেই বলে রাখলাম"।

অদিতি কাঁধ ঝাঁকাল "বোল না কথা। আমিও তখন ফেসবুকে ছেলেবাজি করব"।

তীর্থ বলল "ঠিক আছে"।

অদিতি বলল "তোমার হিংসা হবে না?"

তীর্থ বলল "কেন হিংসা হতে যাবে? তোমার লাইফ, তুমি যা খুশি করবে। শুধু অন্য কোন জায়গা থেকে পেট বাধিয়ে চলে এসো না। কাক হতে পারব না আমি"।

অদিতি চোখ ছোট ছোট করে বলল "তুমি কত বড় ডিসরেসপেক্টফুল কথা বললে ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া এবাউট দ্যাট?"

তীর্থ বলল "ও, তাই নাকি? ডিসরেসপেক্টফুল কথা বললাম? আর তুমি সারাক্ষণ সেলফিস বলে যাচ্ছ তাতে কিছু হয় না বুঝি?"

অদিতি ঠোঁট দিয়ে চুক চুক করে শব্দ করে বলল "লেগেছে না? আচ্ছা সরি আর বলব না। আমার কেন জানি না তোমার উপর যা তা রকমের রাগ হচ্ছে"।

তীর্থ বলল "কেন রাগ হচ্ছে?"

অদিতি বলল "জানি না। অমলেট খেয়েছো বলেই বোধ হয়। অ্যাকচুয়ালি ডিমটা আমার বড্ড কাছের জিনিস। সেটা না বলে খেলে রাগ তো হবেই। এমনিতে যদিও রাগ অভিমান রিয়েল রিলেশনশিপে হয় তবু তোমার ওপর আমার রাগ হচ্ছে"।

তীর্থ গম্ভীর গলায় বলল "ঠিক আছে, এর পর থেকে তোমাকে আগে অমলেট খাওয়াব, তারপর নিজে খাব। খুশি?"

অদিতি বলল "খুশি। তুমি লোক খারাপ নও। সেলফিস হওয়াও কিন্তু ভালই। তার থেকেও ভাল সেটা নিজে নোটিস করতে পারা। তুমি সেটা পারছো। ক'টা মানুষ নিজের উইক পয়েন্ট নোটিস করতে পারে?"

তীর্থ বলল "সেলফিস হওয়া উইক পয়েন্ট কেন হতে যাবে? নিজেকে ভালবাসা কখনও উইক পয়েন্ট হতে পারে না। ইনফ্যাক্ট প্রতিটা মানুষের নিজেকে ভালবাসা উচিত। নিজেকে ভালবাসলেই তো বাকি সবার খেয়াল রাখা যায়। আমি নিজে যদি সুস্থ না থাকি তাহলে আমার অসুস্থ বাবা মা কে দেখব কী করে? আমি সেলফিস। এবং তবু আমার বাবা মাকে ভালবাসি। তাদের মিস করি। এই যে ঘুরতে এসেছি, এর আগে যতবার এসেছি, ওদের নিয়েই এসেছি। আমি ওদের মিস করছি। সেলফিস বলেই নিজের বাবা মাকে ভালবাসা যাবে না, এমনও না"।

অদিতি অনেকটা বিয়ার এক চুমুকে গিলে বলল "ইন্টারেস্টিং সব কথা বলছ তুমি। এবং যুক্তিগুলো কোনটাই ফেলে দেওয়ার নয়। আমাদের রিলেশনটা স্বাভাবিক হলে বলতাম বাবা মা কে নিয়েই ঘুরতে যাব এর পর থেকে। কিন্তু সেটা বলা যাবে না। ওরা না না রকম প্রশ্ন করতে পারেন"।

তীর্থ বলল "হ্যাঁ, করতেই পারেন। তবে ওরা আমাকে চেনেন। আমার পার্সোনাল স্পেসে একবারেই আসবেন না এটা তোমাকে বলতে পারি"।

অদিতি খুশি হয়ে বলল "এটা ভাল। এরকম বাবা মা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার"।

তীর্থ বলল "হ্যাঁ ওরা আমাকে ঘাঁটাবেন না বলেছি। তোমাকে ঘাঁটাতেই পারেন। জিজ্ঞেসও করবেন নাতি পুতি কবে আসবে"।

অদিতি চোখ বড় বড় করে বলল "কী সাংঘাতিক। আমাকে কেন?"

তীর্থ রিমোট দিয়ে চ্যানেল চেঞ্জ করতে করতে বলল "কারণ আমাকে প্রশ্ন করার সাহস নেই কারও"।

অদিতি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল "আমি জানি না। আমি কিছু বলতে পারব না। এরকম চাপ দাও কেন?"

তীর্থ বলল "চাপ দিচ্ছি না। কী কী সিচুয়েশন হতে পারে সেটা আগে থেকে বলে রাখছি। তোমার বাড়ির থেকেও বিয়ে করার চাপ ছিল, আমার বাড়ি থেকেও ছিল। দু পক্ষ একটা মিউচুয়াল এগ্রিমেন্টে বিয়ে করেছি। কিন্তু বাড়ির লোককে কীভাবে সামলাতে হবে সেটা তো কেউই জানি না। তোমার বাড়িতেও তোমার বোনেরা বিয়ের দিন বেশ ভাল মতই জামাই ঠকিয়েছে। আমাকে অনেক জ্বালাতন করেছে, সেই নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই, কারণ আমি জানতাম এসব পার্ট অফ দ্য গেম। তোমাকেও খানিকটা এসবের জন্য মেন্টাল প্রিপারেশন নিতে হবে"।

অদিতি বিমর্ষ মুখে বলল "ঠিক আছে। সামলে নেব। বাচ্চা নেওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল সাগ্নিকের সঙ্গে আমার প্রেমটা ছিল। কত স্বপ্ন দেখতাম, একটা মেয়ে হবে, নাম হবে আঁখি..."

অদিতি চুপ করে গেল।

তীর্থ বলল "মন খারাপ করছে? অমলেট খাবে?"

অদিতি বলল "হ্যাঁ, মাঝরাতে অমলেট খেতে যাব কেন? তুমি তো মহা আতা ক্যালানে লোক!"

তীর্থ বলল "তাহলে কী খাবে?"

অদিতি বলল "কিছু না। আমার মুড ঠিক করতে হবে না। ও এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। তুমিই বেঁচে গেছো। কাউকে ভালবাসো নি, এটাই ভাল। প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কষ্ট ভীষণ। নেওয়া যায় না"।

তীর্থ বলল "ভালবাসা ব্যাপারটাই তো ফিজিকাল। তুমি ওর সঙ্গে শুয়েছো, ওর তোমার ওপর থেকে ইন্টারেস্ট চলে গেছে। ও তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে। সিম্পল"।

অদিতি চুপ করে বসে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল "হু, ও একটা কুকুর ছিল। বেশিরভাগ পুরুষ..."

তীর্থ হতাশ হয়ে বলল "নাও, ঘুরে ফিরে সেই একই কথা!!! উফ!"

অদিতি সোজা হয়ে বসল "শিট!"

তীর্থ বলল "কী হল?"

অদিতি বলল "বমি"।

বলেই অদিতি ঘরের মেঝেতে হড়হড় করে বমি করে দিল।

৫

ঘর ধোয়া হয়েছে। হোটেলের লোক এত রাতে এসেও ধুয়ে দিয়ে গেছে।

অদিতি মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

তীর্থ ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করল। অদিতি তীর্থর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল "কী হল?"

তীর্থ বলল “এমনভাবে খাচ্ছিলে ভাবছিলাম বিরাট কিছু মাতাল তুমি। ছড়ানোশ্রী মাতাল সেটা বুঝিনি। ভাগ্য ভাল হোটেলের লোক এত রাতেও এল, নইলে বমির গন্ধের মধ্যে শুতে হত”।

অদিতি বলল “এত আনন্দ পাবার মত কিছু হয় নি। মে বি অ্যাসিডিটি হয়েছিল তাই বমি করে দিয়েছি। নিজে তো এক ফোঁটাও গেলো নি, বেশি কথা বলার দরকার নেই”।

তীর্থ বলল “আমি বমি জিনিসটা পছন্দ করি না বলেই খাই না। আমার বডি নিতে পারে না এসব। তবে তুমি এমন ভাব নেবে... ফেকু কোথাকার”।

তীর্থ খ্যাক খ্যাক করে হাসতে শুরু করল।

অদিতি বলল “দেখো, তুমি এভাবে হাসলে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিলাম। আমি অন্য ঘর নিয়ে থাকব”।

তীর্থ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল “সরি সরি। আর হবে না”। বলে আবার হাসতে শুরু করল।

অদিতি তীর্থর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রিসেপশনে ফোন করে রুম চাইল। রিসেপশন থেকে জানানো হল কিছুক্ষণ আগে একটা বড় দল এসেছে। সব ঘর বুক হয়ে গেছে। অদিতি ফোন রেখে কট মট করে তীর্থর দিকে তাকিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে চেয়ারে বসে চেঁচিয়ে বলল “আমি সারারাত এখানে কাটাব। অসভ্য লোক কোথাকার”।

তীর্থ ব্যালকনিতে গিয়ে বলল “আচ্ছা আমি আর হাসব না। মাইরি বলছি”।

অদিতি বলল “আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। যে লোক একা একা অমলেট খেতে পারে সে মানুষ খুন করতে পারে”।

তীর্থ মাথায় হাত দিয়ে বলল “আচ্ছা। রাগ কমাও। আমাদের মিউচুয়াল ম্যারেজের চুক্তিতে এত রাগ ছিল না কিন্তু”।

অদিতি বলল “ওরম অসভ্যের মত খ্যাক খ্যাক করে হাসাও ছিল না। তুমি শুধু সেলফিসই নও, একজন অত্যন্ত অসভ্য লোক”।

তীর্থ এবার রাগল “তুমি আবার আমায় সেলফিস বললে?”

অদিতি বলল “বেশ করেছি বলেছি। নিজে খ্যাক খ্যাক করে হাসছিলে তার বেলা?”

তীর্থ কয়েক সেকেন্ড অদিতির দিকে তাকিয়ে বলল “যা পারো কর, আমি ঘুমালাম”।

ঘরে ঢুকে তীর্থ এসি চালিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

অদিতি কয়েক মিনিট শক্ত মুখ করে ব্যালকনিতে বসে রইল। সমুদ্রের হাওয়া আসছে ঠিকই, কিন্তু কোত্থেকে কয়েকটা মশা এসে কামড়াতে শুরু করেছে।

অদিতি “ধুত্তোর” বলে ঘরে ঢুকে খাটে শুয়ে তীর্থর থেকে পুরো কম্বলটাই নিয়ে নিল।

তীর্থ উঠে “একী একী” বলে বসে বলল “কী করছ?”

অদিতি বলল “তুমি একাই কম্বল নিয়ে শুয়েছো কেন? আমার কম্বল লাগে না?”

তীর্থ বলল “তা বলে তুমি এভাবে কম্বল টেনে নেবে? তুমি তো ডেঞ্জারাস মেয়ে”!

অদিতি বলল “ভদ্রলোকের মত থাকলে ভদ্রলোকের মত ব্যবহার পাবে, নইলে এরকমই হবে। নাও এবার। আমার থেকে এক হাত দূরে শোবে। আর খবরদার রাত্তিরে গায়ে হাত দেবে না”।

তীর্থ বলল “হুহ, আমার বয়ে গেছে ঐ গন্ধ বমিওয়ালা গায়ে হাত দিতে। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যেন আমার”।

অদিতি চোখ ছোট করে বলল “আমারই ভুল হয়েছে। উচিত ছিল তোমার গায়ে বমিটা করা। তাহলে মজাটা বুঝতে”।

তীর্থ উল্টো মুখ করে শুয়ে বলল “যা পারো কর। আমি ঘুমালাম”।

অদিতি গজগজ করতে করতে শুল। কয়েক সেকেন্ড পরে অদিতি আর্তনাদ করে উঠল "উফ! কী বিচ্ছিরি গন্ধ। এই তোমার পেট পরিস্কার হয় না? বাথরুমে যাও"।

তীর্থ সাড়া দিল না।

অদিতি তীর্থকে ঠেলতে শুরু করল "এই ছেলে, এই অসভ্য ছেলে! বাথরুমে যাও"।

তীর্থ বলল "বিরক্ত কোর না। আমার বড় বাইরে পায় নি"।

অদিতি বলল "না পেলে গিয়ে বসে থাকো। এভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটিও না। উফ! এরকম জানলে জীবনেও বিয়ে করতাম না তোমায়। ঈশ কী দুর্গন্ধ মাগো!"

তীর্থ বলল "হ্যাঁ, নিজে তো সুগন্ধে চারদিকে ভরিয়ে রেখেছো"।

অদিতি বলল "এই তিন চার দিন তো বুঝি নি তুমি এমন বিষ মাল! একটা মেয়ে আছে ঘরে, মিনিমাম সভ্যতা ভব্যতা থাকবে না?"

তীর্থ বলল "আমি তো সভ্যভাবেই ছিলাম। হঠাৎ করে একটা অ্যাক্সিডেন্টাল দুর্গন্ধ বেরোতেই পারে। এখানে আমার হাত থাকবে কী করে?"

অদিতি বলল "হাত না, তোমার ইয়ে আছে। প্লিজ আমাকে একটু শান্তিতে ঘুমাতে দাও। বমি করার পর থেকে ভাল লাগছে না। এরকম গন্ধ পেলে আবার বমি হয়ে যাবে খাটের ওপরে তখন বুঝবে"।

তীর্থ ভয় পেয়ে উঠে বাথরুম যেতে যেতে বলল "ওরে বাবা। ঠিক আছে, আমি দেখছি কিছু করা যায় নাকি"।

তীর্থ বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে অদিতি চোখ বন্ধ করল।

মিনিট দশেক পরে তীর্থ ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল "একী! তুমিও তো দিয়েছো! এবার কে অসভ্যতা করল?"

অদিতি সাড়া দিল না। তীর্থ কয়েক সেকেন্ড পায়চারি করে বলল "ঐতিহাসিক ভুল করেছি আমি বিয়ে করে। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। বিয়ে মানেই ঝামেলার জিনিস! উফ! এরকম জানলে কে বিয়ে করত!"

ঘরের ভেতর সশব্দে একটা শব্দ হল। তীর্থ বলল "বাপরে! যেন বাজ পড়ছে। এই মেয়ে তুমি বাথরুম যাও!"

অদিতি সাড়াশব্দ করল না।

তীর্থ মোবাইল বের করে জোরে গান চালিয়ে দিল।

অদিতি ঘুমের ঘোরে বলল "কী হল? ঘুমাতে দেবে?"

তীর্থ বলল "তুমি বাথরুমে যাবে? ঘরটাকে তো পুরো ধাপার মাঠ বানিয়ে দিয়েছো। আমাকে বাথরুমে যেতে বলে নিজে এখানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ করতে শুরু করেছে"।

অদিতি বলল "সকালে সকালে। তুমি ঘুমাও"।

তীর্থ রেগে খাটে শুল। মিনিট খানেক পর অদিতি একটা হাত তীর্থর বুকের উপর দিয়ে তীর্থকে জড়িয়ে ধরল।

তীর্থ সভয়ে বলল "ওরে বাবা। এসব কোর না। আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারব না"।

অদিতি তীর্থকে ছাড়ল না।

তীর্থ বলল "সর্বনাশ হল তো! এ মেয়েকে বিয়ার খাওয়ানোটাই ভুল হয়েছে। সাংঘাতিক মাতাল প্রকৃতির মহিলা। এই, শোন না। চুক্তি বহির্ভূত কাজ হচ্ছে।"

অদিতি তীর্থর গালে চুমু খেল।

তীর্থ শিউরে উঠে বলল "এ কী শুরু করল। এবার তো নিম্নচাপ ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে উপকূলে আছড়ে পড়বে। শোন না। এসব চুক্তিতে ছিল না"!

অদিতি নেশা ধরা গলায় বলল "চুক্তির গুলি মারি। আর ইউ এ ম্যান? প্রমাণ কর দেখি!"

তীর্থ তেড়ে মেড়ে উঠে বলল "তবে রে!"

৬

ভোর ছ'টা।

তীর্থ ঘুমাচ্ছিল।

অদিতি ঠেলে ওকে ঘুম থেকে তুলল "এই যে, ওঠো, ওঠো"।

তীর্থ ধড়মড় করে উঠে বসে বলল "কী হল? পাকিস্তান বোম মেরেছে?"

অদিতি রাগী গলায় বলল "পাকিস্তান বোম মারে নি। তবে আমি তোমায় বোম মারব। তোমার গায়ে কোন পোশাক নেই কেন? আমার গায়েই বা কিছু ছিল না কেন?"

তীর্থ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নিজের নিচের দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে কম্বল টেনে নিয়ে বলল "তুমিই তো ইনসিস্ট করলে! বললে আমি পুরুষ নাকি দেখতে চাও! আমি কী করব? বার খাইয়ে দিলে কেন?"

অদিতি মাথায় হাত দিয়ে বড় বড় চোখে তীর্থর দিকে তাকিয়ে বলল "করে ফেলেছো?"

তীর্থ অবাক গলায় বলল "কী করব?"

অদিতি বলল "মহা ন্যাকা তো! জানো না কী করার কথা বলছি?"

তীর্থ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বোঝার চেষ্টা করল। বুঝতে পেরে বলল "ও, মানে সেক্সের কথা বলছ?"

অদিতি বলল "না আমি এন আর সি অ্যাপ্লিকেশন করার কথা বলছি। আচ্ছা আপদ তো!"

তীর্থ বলল "অ্যাকচুয়ালি আমি ভার্জিন তো। আমি কী করে কী করতে হয় জানতাম না। তুমিই শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে আর কী!"

অদিতি বলল "আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নিলাম! তুমি বোঝ নি নেশার ঘোরে ছিলাম আমি? কী করছিলাম সেটা বোঝার ক্ষমতাই ছিল না আমার?"

তীর্থ বলল "না। বুঝব কী করে? তুমি আমাকে কী যেন বলে, উত্তেজিত করে দিয়েছিলে। আর আমি কী করব?"

অদিতি বলল "আমি জাস্ট বিশ্বাস করতে পারছি না সিরিয়াসলি। তুমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলে না?"

তীর্থ বলল "দেখো অদিতি, আমি তো কোন ঋষি মুনি নই যে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারব! তুমি আমাকে সিডিউস করেছো, আমার আর কিছু করার ছিল না। ঢাল ছিল, নদী বয়ে গেছে।"

অদিতি বলল "বাহ, ভাল কথা বল তো তুমি! ঢাল ছিল? এটা কেমন উপমা?"

তীর্থ বলল "দেখো মাঝরাতে ওরকম পিকিউলিয়ার বিহেভ করলে, ভোরবেলা উঠে ভাইভা নেওয়া শুরু করেছো অর্ণব গোস্বামীর মত। আমার টায়ার্ড লাগছে। আমি শুই? পরে উত্তর দেব?"

অদিতি বলল "টায়ার্ড লাগছে মানে? কী পরিশ্রম করেছো তুমি টায়ার্ড লাগার মত?"

তীর্থ বলল "উফ আবার প্রশ্ন! প্লিজ আমাকে ঘুমাতে দাও"।

অদিতি খিচিয়ে উঠল "ঘুমাও তুমি ঘুমাও! যা ইচ্ছে কর। আমি আর কিছু বলব না তোমাকে"।

তীর্থ কথা না বাড়িয়ে চোখ বুজল। অদিতি পায়চারি শুরু করল বিড়বিড় করতে করতে, "কী করেছে কে জানে! আজব একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে হল আমার! কেন আমি এই বোকামোটা করতে গেলাম! আমার বোঝা উচিত ছিল সব পুরুষ এক রকম। সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ে না"!

তীর্থ চোখ বন্ধ করেই বলল "সুযোগের কিছু নেই। সামনে বিরিয়ানি রেখে কেউ খাও না খাও না করলে খাবোই। আমার কী দোষ?"

অদিতি বলল "তোমার কী দোষ? প্রেগন্যান্ট হলে তুমি হবে? এই ঢপের বিয়েতে প্রেগন্যান্ট? সম্ভব?"

তীর্থ বলল "সেটা বিয়ার খেয়ে বাওয়াল করার আগে ভাবা উচিত ছিল"।

অদিতি থতমত খেয়ে বলল "আ... আমি ভেবেছি তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে। তোমায় রেসপন্সিবল ভেবেছিলাম। বড় বড় কথা বলছিলে তো!"

তীর্থ বলল "ইউ আর রিয়েলি অ্যামেজিং! আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে? কেন বল তো? তাহলে শুরু থেকেই দুটো রুম নেওয়া উচিত ছিল! তুমিই বলেছিলে একটা ঘরেই থাকা যায়। নিজে ইনসিস্ট করলে কাল আর আমায় এখন দোষ দিয়ে যাচ্ছ!"

অদিতি বলল "আমি কিছু জানি না, আমি প্রেগন্যান্ট হতে চাই না। তুমি কী করবে কর"!

তীর্থ বলল "ধুস! একটু ঘুমাতে দেয় যদি! আমি কী করব! মানে আমার কী করার আছে? আমার এসব ব্যাপারে কোন এক্সপেরিয়েন্স নেই বলেছি তো। তুমিই তো শিখিয়ে পড়িয়ে দিলে! আমার বরং এখন কেমন ইয়ে ব্যথা করছে। প্রথম বার তো!"

অদিতি বলল "তোমার ইয়েটা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে আসো। কন্ট্রোললেস পাবলিক কোথাকার"।

তীর্থ বলল "শোন, আমার কথা শোন, তুমি মাথা ঠান্ডা কর। আজ তো চিল্কা যাবার কথা। ঘুরে আসি। তারপর দুজনে কথা বলে একটা ডিসিশন নেওয়া যাবে"।

অদিতি বলল "চিল্কা যাব? এখনও? সিরিয়াসলি? তুমি এত ইনোসেন্ট কি জন্ম থেকেই নাকি কোন আলাদা কোর্স করেছো?"

তীর্থ অবাক হয়ে বলল "মানে? এতে ইনোসেন্ট হবার কী আছে? কাল তো ট্রাভেল এজেন্টকে গাড়ির জন্য অ্যাডভান্স করে দিয়েছি। সে টাকা নষ্ট হবে না? আর প্রেগনেন্সি এটসেট্রা এত সোজা নাকি? কিছু করে অ্যাভয়েড করা যায় না?"

অদিতি বলল "সব যায়। কিন্তু আমার সমস্যা সেটা না। আমার সমস্যা হল তুমি একটা বহুত ফালতু লোক। বড় বড় কথা বলে আসল জায়গায় এসে ছড়িয়ে লাট করে দিয়েছো। তোমার উচিত ছিল কন্ট্রোল করা"।

তীর্থ বলল "আমি শুনেছিলাম মেয়েরা যুক্তি, টুক্তি না বুঝেই ভাট তর্ক করে যায়, তোমাকে দেখে আমি আজ কনফার্ম হলাম। নিজে বিয়ার খেয়ে বমি করে ঘর ভাসিয়ে আমাকে ওসব করতে ইনসিস্ট করলে আর তখন থেকে একই হ্যাজ দিয়ে যাচ্ছ। আমাকে ফালতু বলার আগে নিজের দিকে তাকাও"।

অদিতি রাগী চোখে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তীর্থ কম্বল সরিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে জিভ বের করে বলল "আমার বারমুডা? আমার বারমুডা কোথায়?"

ঘরের এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল মেঝেতে বারমুডা পড়ে আছে। তীর্থ গলা বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কেউ আসছে নাকি দেখে লাফ দিয়ে মেঝেতে গিয়ে বারমুডাটা তুলে পরে নিল। গেঞ্জি গায়ে চড়িয়ে আবার বিছানায় শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করল।

মিনিট দশেক পরে অদিতি ঘরে ঢুকে তীর্থর দিকে তাকিয়ে বলল "অদ্ভুত! অদ্ভুত! চুক্তিভঙ্গকারী ফিলিপ মোষ কোথাকার! জেল হওয়া উচিত তোমার! এই ওঠো তো!"

তীর্থকে ঠেলতে শুরু করল অদিতি। তীর্থ বিরক্ত গলায় বলল "কী হল? আবার এখন করতে ইচ্ছা করছে নাকি?"

অদিতি বলল "শোন, কথাটা ভাল করে শোন। যেটা হয়েছে, সেটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। আর যেন না হয়। এরপরে আমি বিয়ার খাই, হুইস্কি খাই, বাংলা খাই যা খুশি খাই, খেয়ে তোমায় যা খুশি করি, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে শিলা কী জওয়ানি নাচি, তুমি নিজেকে কন্ট্রোল করবে? ক্লিয়ার?"

তীর্থ বলল "ক্লিয়ার। এবার শুতে পারি?"

অদিতি বলল "আমার জন্য একটা ওষুধ এনে দিতে হবে"।

তীর্থ বলল "দেব। দোকান খুলতে দাও"।

অদিতি খানিকটা শান্ত হয়ে বলল "ওকে। ঘুমাও। আমার মাথা কাজ করছে না আসলে। আমার বিয়ার খাওয়া উচিত হয় নি"।

তীর্থ বলল "তা মাঝে মাঝে খেও। ভালই লাগল ব্যাপারটা"।

বলেই কম্বল মুড়ি দিল।

অদিতি চ্যাচাতে শুরু করল "কী? কী বললে? বলবেই তো! ম্যান ওয়ান্টস ওনলি ওয়ান থিং। আমিই গাধা যে বিয়ার খেতে গেলাম। শিট, শিট"।

৭

সকাল সাড়ে এগারোটা।

চিল্কায় নৌকায় উঠেছে দুজন।

রোদ ঝলমল করছে আকাশে। তবে অদিতির মুখ ভার। তীর্থ লাইফ জ্যাকেট খুলে বলল "উফ, এসব কেউ পরে? এর জন্য আবার পঞ্চাশ টাকা করে নিল। লোককে মুরগী করার নতুন নতুন টেকনিক যত"!

অদিতি বলল "তুমি ঐ দোকানে লাঞ্চে এত খাবারের অর্ডার দিলে কেন? এত মাছ কে খাবে?"

তীর্থ বলল "আমি খাব। তুমি যতটা পারবে খেও। বাকিটা আমি খাব"।

অদিতি চোখ কপালে তুলে বলল "অত খেতে পারবে?"

তীর্থ বলল "হ্যাঁ, না খাওয়ার কী আছে। এরকম ফ্রেশ মাছ কোথায় পাওয়া যাবে?"

অদিতি চেঁচিয়ে মাঝিকে জিজ্ঞেস করলে "কত দূরে যেতে হবে?"

মাঝি বলল "আগে ডলফিন পয়েন্ট যাচ্ছি। ওখানে ডলফিন দেখে নিন তার পর রেড ক্র্যাব আইল্যান্ডে নিয়ে যাব"।

তীর্থ বলল "ওই দেখো, ডলফিন পয়েন্ট নাকি। ডলফিন দেখাবে"।

অদিতি বলল "যা দেখাবে দেখাবে। আমার ভাল লাগছে না। সকাল থেকে আমার একবারেই মন মেজাজ ভাল নেই। আমার কাল বিয়ার খাওয়া ঠিক হয় নি"।

তীর্থ বলল "ও। শোন, তুমি যেটা ভাবছ সেটা না। আমি আমাদের অ্যাগ্রিমেন্ট ব্রেক করব না। বরং আজ থেকে আমিও প্রি কশান নেব যাতে এই ধরণের ঘটনা আর না ঘটে। এই ব্যাপারটাকে ভুলে যাও বরং। না ভুললে সমস্যা বাড়বে। আমাদের এই বিয়েটার পারপাসই ছিল বাড়ির লোক এবং এদিক সেদিকের লোকের ফিসফিস কমাতে আমরা এই বিয়েটা করব। একটা চুক্তির বিয়ে। সেখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে।

সেটা ভেবে মন খারাপ করে লাভ নেই। তুমি অন্য কিছু ভাবো বরং যেটা তোমাকে চিয়ার আপ করতে পারে”।

অদিতি বলল “তুমি জানো না আমার বাড়ি থেকে কতখানি বিয়ের প্রেশার ছিল। অনেক কষ্ট করে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম সব কিছু। আমার মা বাবার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। বাড়ি ফিরতে পারছিলাম না। রাত করে ফিরলেও বাবার অশান্তি, মার ঘ্যান ঘ্যানে পাগল হয়ে গিয়ে শেষ মেশ বিয়ের জন্য রাজি হলাম। এখন যদি আবার কোন কারণে আমি একটা অ্যাটাচমেন্টে জড়িয়ে পড়ি এবং তারপর আবার হার্ট ব্রেক হয় তাহলে আমি জাস্ট শেষ হয়ে যাব। সাগ্নিক আমাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে ইমোশনালি এবং ফিজিক্যালি। তারপর ডিচ করে চলে গেল। আমার মনে হচ্ছিল আমাকে কেউ মাঝ পথে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমার জায়গায় থাকলে হয়ত বুঝতে পারতে”।

তীর্থ বলল “দেখো, একটা পাস্ট রিলেশন বার বার কচলালে তেতো হয়ে যায়। দেখো কী সুন্দর বক বসে আছে। বিভিন্ন পাখী দেখো। এসব দেখে সব ভুলতে চেষ্টা কর। তোমার মত আমারও কোন সিরিয়াস সম্পর্কে যেতে অ্যালার্জি আছে। এই যে তুমি সাগ্নিকের কথা বললে, আমার সেরকম কেউ ছিল না। কিন্তু আমার অফিসে প্রবল চাপ আছে। এই চাপের জন্য দূরে কোথাও যেতেও তো পারলাম না। তিন দিন মাত্র ছুটি ম্যানেজ করে এলাম। সারাক্ষণ অফিস আর কাজের প্রেশার সামলে আমাকে চলতে হয়। এর মাঝে সংসার, বাচ্চা... এসব যদি হয় তাহলে এর দায়িত্ব আমি নিতে গেলে আমার হয়ে গেল। তুমি আমাকে নিয়ে একবারেই ভেবো না, আমি তোমাকে ঠিক আটকে দেবো এর পর থেকে”।

অদিতি হাসল “থ্যাংক্স। কথাগুলো মনে রেখো, তাহলেই হবে”।

পাশের একটা নৌকায় একজোড়া নব দম্পতি যাচ্ছে। স্বামী স্ত্রী একে অপরকে জড়িয়ে নানা ভঙ্গিতে ছবি তুলছে। অদিতি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল “ন্যাকামি যত”।

তীর্থ বলল “ন্যাকামির কিছু নেই। এসব তো করেই থাকে লোকে। তোমার সাগ্নিকের সঙ্গে বিয়ে হলে তুমিও করতে”।

অদিতি বলল “তা করতাম। প্রেম থাকাকালীনও অনেক করেছি। যেদিন ডিচ করেছিল তার আগের দিনও আমাদের সেলফি পোস্ট করেছিলাম। সাগ্নিক আমাকে ব্লক করে দিয়েছিল। আমি অনেকক্ষণ বসে বসে কেঁদেছিলাম। এরকম কেন হবে? এরকম কেন হল? আমাকে ব্লক করবে কেন? ব্লক করার কী আছে? ভেবেছিলাম আজকের দিনটা যাক ঠিক আছে, পরের দিন নিশ্চয়ই ফোন করে ক্ষমা চাইবে। পরের দিনও করল না। তিন দিন পরে ফোন করলাম। একটা মেয়ে ধরে বলল সে নাকি সাগ্নিকের গার্লফ্রেন্ড। ফোনটা কেটে দেবার পর আমার জ্বর এসেছিল। ভীষণ জ্বর”।

তীর্থ বলল “রিলেশনশিপ জিনিসটাই এমন। যারা ব্রেক আপ করে তারা কীভাবে করে আমি জানি না। ব্রেক আপ ব্যাপারটা আছে কী করে পৃথিবীতে? যাকে কেউ ভালবাসে তাকে এত সহজে ভুলে যায় মানুষ? রাস্তায় দেখা হলে চিনতে পর্যন্ত পারে না?”

অদিতি চমকে গিয়ে বলল “কী বললে? রাস্তায় দেখা হলে চিনতে পর্যন্ত পারে না? এই তুমি ঢপ মেরেছো আমাকে। সত্যি করে বল তো কোন মেয়ে তোমাকে ডিচ করেছিল?”

তীর্থ প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল “কেউ না, কেউ না। মাইরি বলছি কেউ না”।

অদিতি মাঝির দিকে তাকাল। মাঝি তাদের দেখছে না। আশে পাশে এখন কোন নৌকাও নেই। অদিতি তীর্থর জ্যাকেট খামচে ধরে বলল “সত্যি করে বল নইলে একদম খিমচে দেব। আমার খিমচানো জগত বিখ্যাত”।

তীর্থ সভয়ে বলল “ওরে বাবা খিমচিও না এখানে টিটেনাস পাব কোত্থেকে?”

অদিতি বলল “কী? টিটেনাস? আমি কুকুর?”

তীর্থ বলল “না না সে বলি নি”।
অদিতি বলল “সে সব ছাড়ো। সত্যি করে বল তোমার কী কেস? শালা বুকে ব্যথা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর নিজের সেলফিস ইমেজ ক্রিয়েট করছে। হেবি ডেঞ্জার জিনিস তো তুমি গুরু”।
তীর্থ চারদিকে তাকিয়ে বলল “বলছি বলছি, জ্যাকেটটা ছাড়ো। ঈশ কেউ দেখলে কী ভাববে?”
অদিতি বলল “আগে নাম বল। কেস বল তারপর বলছি”।
তীর্থ ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদতে শুরু করল।
অদিতি বলল “এই মরেছে। কাঁদছ কেন? আচ্ছা আচ্ছা জ্যাকেট ছাড়লাম। বলতে হবে না”।
মাঝি চেঁচিয়ে উঠল “ঐ ঐ ডলফিন”।
দুজনে মাথা ঘুরাল, কিছুই দেখা গেল না। মাঝি একবার এদিকে নৌকা নেয়, ওদিকে নৌকা নেয়। অদিতি চেঁচিয়ে বলল “ঝুট বল কেন? কোথায় ডলফিন?”
মাঝি বলল “ছিল ছিল। দেখুন ভাল করে”।
চারদিকে শুধু জল আর জল কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একগাদা নৌকা এসে গেছে ডলফিন পয়েন্টে। সবাই কৌতূহলী চোখে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তীর্থ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল “সুপর্ণা, ওর নাম ছিল সুপর্ণা”।
অদিতি হৈ হৈ করে উঠল “ঐ তো ডলফিন। ঐ দেখো”।
তীর্থ বলল “ধুত্তোর ডলফিন। তুমি সুপর্ণার কথা শোন। আমাকে সেলফিস বলে চলে গেছিল”।
অদিতি বলল “কেন? তুমি অমলেট খেয়ে ফেলেছিলে নিশ্চয়ই?”
তীর্থ বিরক্ত গলায় বলল “ফিলিপ ঘোষের মাথায় যেমন গরু ঘোরে তোমার মাথায় কি সারাদিন অমলেট ঘোরে? আর কিছু ঘোরে না?”
অদিতি বলল “আচ্ছা সরি সরি। এই তুমি প্রেম করেও ভার্জিন ছিলে এই ওয়ো রুমের যুগেও? কী ভাল মাইরি তুমি?”
তীর্থ কটমট করে অদিতির দিকে তাকাল।

৮

“ওয়ো রুম অ্যাভেলেবল হলেই যে যেতে হবে এটা তোমাকে কে বলল?”
তীর্থ বলল।
নৌকো ক্র্যাব আইল্যান্ডের দিকে রওনা দিয়েছে।
অদিতি বলল “ভালোবাসায় শরীর তো স্বাভাবিক নিয়মেই আসবে। এই যুগে সেটা না হওয়াটাই আমার অস্বাভাবিক লাগে। দুটো ছেলে মেয়ে পাশাপাশি ঘুরলে হাতে হাত লাগলে বিদ্যুৎ খেলবে না?”
তীর্থ জলের দিকে তাকিয়ে বলল “খেলবে। তবে তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছিল কোথাও একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। আমরা দেখা করেছি, কথা বলেছি, কিন্তু আমি কখনই ওকে সে প্রস্তাব দিই নি”।
অদিতি মুখ বেঁকিয়ে বলল “সে জন্যই তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে মেয়েটা”।
তীর্থ বলল “সব না জেনেই এরকম একটা ডিসিশন নিয়ে নিলে কেন?”
অদিতি বলল “নিলাম কারণ ছেলেদের একটা জেনারেল ধারণা হল মেয়েদের স্বাভাবিক কাম থাকবে না। তাদের সেক্স করতে ইচ্ছা করবে না। তাদেরও যে ছেলেদের মতই ইচ্ছা করে এটাই বেশিরভাগ ছেলে

বুঝতে চায় না বা বুঝতে পারে না"।

তীর্থ বলল "ও। না, সেসব কিছু ছিল বলে তো মনে হয় না। বেশিদিন চলেও নি তো ব্যাপারটা। মাস খানেক হবে"।

অদিতি অবাক হয়ে বলল "মাসখানেক? মাত্র? এর বেশি তো আমাদের বাড়ির গ্যাস চলে এত বেশি রান্না হওয়া সত্ত্বেও"।

তীর্থ বলল "হ্যাঁ মাস খানেকই। আর তার কারণ হল ও আমাকে স্টেপনি হিসেবে রেখেছিল। ওর একজন স্টেডি বয়ফ্রেন্ড ছিল। তার সঙ্গে ব্রেক আপ হয়ে গেছিল। আমি সেটা জানতাম না। ক'দিন ঘুরল। তারপর ফোন ধরা, মেসেজ করা বন্ধ করে দিল। আমি কোন কালেই ন্যাগিং ছিলাম না। পরে ফেসবুকে ফেক থেকে দেখে বুঝলাম আগের লোকের সঙ্গে প্যাচ আপ হয়ে গেছে"।

অদিতি হেসে গড়িয়ে পড়ল "ধুস, তুমি পাতি মুরগী হয়েছিলে আর কিছু না"।

তীর্থ অন্যমনস্কভাবে বলল "হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো, মুরগী হয়েছিলাম। একজনের সম্পর্কের মধ্যে না জেনে ঢুকে পড়েছিলাম। জানলে অবশ্যই করতাম না। তবে কী জানো তো, আমার মত মানুষেরা যারা এরকম সম্পর্কে না জেনে ঢুকে যায় আর রিজেক্টেড হয়, মানুষ ভাবে তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় না। কষ্ট যে তাদেরও হয় সেটা কেউ বুঝতে চায় না। বরং তাদের এরকম মুরগী ইত্যাদিই ভাবে। সুপর্ণার সঙ্গে আমার নন্দনে দেখা হয়েছিল। ওর বয়ফ্রেন্ড ছিল ওর সঙ্গে। আমাকে দেখেও দেখল না। আমি আর ডাকি নি"।

অদিতি বলল "তুমি বহুদিন সিঙ্গল ছিলে, তাই তো?"

তীর্থ বলল "হ্যাঁ। আমি সেরকম ভাবে ডেসপারেটও ছিলাম না। সুপর্ণাই আমাকে জোর করে জড়িয়েছিল। তারপরে নিজেই ছেড়ে গেল"।

অদিতি বলল "সিঙ্গল ছেলেদের এটা সমস্যা। হিস্ট্রি দেখে না, মেয়েদের জিওগ্রাফি দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। শেষমেশ দাগা খেয়ে ফেসবুকে দুলাইনের ছন্দ মেলানো কবিতা কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে লিখে বিখ্যাত কবি হয়ে যায়"।

তীর্থ মুখ গোমড়া করে বলল "আমি কবিতা লিখি না"।

অদিতি বলল "লেখো না তবে শেয়ার করতে দেখেছি তোমাকে"।

তীর্থ বলল "আমার যে লেখাগুলোর সঙ্গে নিজেকে রিলেট করতে পেরেছি সেগুলো শেয়ার করেছি। দু লাইনের কবিতা হোক না, সমস্যা কোথায়?"

অদিতি বলল "সমস্যা কিছুই না। তবে সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে রিলেট না করে, ফ্রাস্ট্রু না খেয়ে এগিয়ে যাওয়ার নামই জীবন"।

তীর্থ বলল "হ্যাঁ সে তো বুঝতেই পারছি। সাগ্নিকের থেকে লেঙ্গি খেয়ে কন্ট্র্যাক্ট ম্যারেজ করার নাম জীবন। থামো,বড় বড় কথা বলে লাভ নেই"।

অদিতি রেগে গিয়ে বলল "তুমি আবার সাগ্নিককে টানলে? তোমার সুপর্ণা আর সাগ্নিক এক হল? আমাদের সম্পর্কটা তোমার মত স্টপ গ্যাপ রিলেশন ছিল না"।

তীর্থ বলল "তাতে কী হয়েছে? তুমিই তো বললে রিলেট না করে এগিয়ে যাবার নাম জীবন। তুমি এগিয়ে যাও নি কেন? আরেকটা ছেলের সঙ্গে না জড়ালেও পারতে"।

অদিতি বলল "তোমার সঙ্গে জড়িয়েছি? জড়াই নি তো! তোমার সঙ্গে বিন্দুমাত্র কিছু হবে না আমার, নিশ্চিন্ত থাকো"।

তীর্থ বলল "আমারও কিছু হবে না। তবে দয়া করে রাত্রিবেলা বিয়ার গিলে আমাকে সিডিউস করতেও আর এসো না। আমিও মানুষ, আমারও সমস্যা হয়"।

অদিতি খানিকটা নিভে গিয়ে বলল “তুমি হোটেলে গিয়ে আলাদা ঘরের কথা বলবে। এই হোটেলে না হলে অন্য হোটেলে যাব। আমি একটা ভুল করেছি, কিন্তু তুমিও যে ভুল করেছো সেটা কিছুতেই তুমি স্বীকার করবে না আমি বুঝছি”।

তীর্থ বলল “মেনকা সিডিউস করেছিলেন বলে স্বয়ং বিশ্বামিত্র মুনিরও ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল, আমি তো কোন ছাড়। এর পর থেকে বরং অন্য ঘরেই শুয়ো। বেটার হয়”।

নৌকো একটা ছোট দ্বীপে পৌঁছল। দুজন লোক নদীর তীরে অপেক্ষা করছিল। নৌকার কাছে এসে কাঁকড়া দেখাতে শুরু করল।

তীর্থ বলল “আমি একটু টয়লেট করে আসছি”।

অদিতি কিছু বলল না। তীর্থ নৌকো থেকে নেমে গেল। তার পা ভিজল খানিকটা। হাঁটতে হাঁটতে সে গাছের আড়ালে চলে গেল।

অদিতিকে লোকগুলো ঝিনুক থেকে কী করে মুক্তো বের করে দেখিয়ে বলল “কিনবেন?”

অদিতি বলল “কত দাম?”

একজন বলল “তিনশোটাকা”।

অদিতি বলল “নাহ্‌ কিনব না”।

লোকগুলো মাথা নাড়ল ঠিক আছে। একজন মুনস্টোন দেখাতে শুরু করল।

অদিতি অধৈর্য হয়ে বলল “আমি দেখতে চাইছি না। আপনারা যান”।

লোক দুজন তার দিকে কেমন ভাবে তাকাল।

অদিতির ভয় লাগল হঠাৎ করে। তাদের মাঝিও এগিয়ে এসেছে।

সে চেঁচিয়ে উঠল “তীর্থ, এই তীর্থ”।

তীর্থ কোন সাড়া দিল না।

মাঝি বলল “ম্যাডাম আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? ওরা মুক্তো দেখাচ্ছে, দেখুন না”। হাসল মাঝিটা কেমন করে।

অদিতির মনে হল তার জ্বর আসছে। ভীষণ জ্বর।

৯

সন্ধ্যেবেলা।

তারা সমুদ্রের সামনে বসে আছে। কিছুক্ষণ আগে ফিরে আর হোটেলে যায় নি এখনও।

তীর্থ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল “অনেকদিন পর ভাল চিংড়ি খেলাম। কী অসাধারণ টেস্ট তাই না?”

অদিতি অন্যমনস্কভাবে বলল “হু”।

তীর্থ বলল “কী হল? মুড অফ কেন?”

অদিতি বলল “কিছু না”।

তীর্থ বলল “চা নিয়ে আসব? খাবে?”

অদিতি বলল “নাহ্‌। দুপুরের খাওয়াই হজম হয় নি এখনও”।

তীর্থ বলল “সে কী? আমার তো কখন হজম হয়ে গেছে। সমুদ্রের হাওয়ায় সারাক্ষণ খিদে পেয়ে যাচ্ছে আমার। তুমি জেলুসিল খাবে?”

অদিতি মাথা নাড়ল “না, খাব না”।

তীর্থ কাঁধ ঝাকাল "ওকে। ক্র্যাব আইল্যান্ডের ঘটনাটা নিয়ে তুমি কি খুব আপসেট হয়ে পড়েছো? ওরা কিন্তু ওরকম ছিল না যেমন তুমি ভেবেছিলে"!

অদিতি বলল "জানি"।

তীর্থ বলল "তবে? ওরকম করে চিৎকার জুড়লে কেন?"

অদিতি মাথা নিচু করল "জানি না। আমার ভীষণ ভয় লেগে গেছিল। মনে হচ্ছিল ওরা আমাকে টেনে কোথাও নিয়ে যাবে"।

একজন লোক একগাদা মালা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল বিক্রির জন্য। তীর্থ বলল "লাগবে না বলেছি তো"।

অদিতি লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল "কিছু লাগবে না দাদা। প্লিজ যান"।

লোকটা বিমর্ষ মুখে হাঁটতে শুরু করল।

তীর্থ ডাকল "আচ্ছা শুনুন। একটা হার দিয়ে যান।"

অদিতি বলল "লোকটার জন্য কষ্ট লাগল?"

তীর্থ বলল "হু"।

অদিতি কিছু বলল না। তীর্থ একটা হার কিনে অদিতিকে দিয়ে বলল "এ নাও। পরবে"।

অদিতি বলল "ঠিক আছে"।

তীর্থ বলল "তুমি ওভাবে আতঙ্কিত হয়ে গেছিলে কেন বলবে? অসুবিধা থাকলে বোল না"।

অদিতি মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল "সাগ্নিকের ফ্ল্যাটে সেদিন একটা ছোট গ্যাদারিং ছিল। ওর তিন চারজন কলিগ, বস এটসেট্রা। ড্রিংক্সের সঙ্গে কিছু একটা মিলিয়ে দিয়েছিল আমায়। ঘোর ভেঙে দেখি আমার সঙ্গে ওর বস শুয়ে আছে। আমার গায়ে কিচ্ছু নেই। কোনরকমে উঠে ওকে ধরলাম। আমাকে ও বোঝাতে শুরু করল এগুলো খুব ন্যাচারাল। সামনেই একটা প্রোমোশন পাওয়ার চান্স আছে ওর। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, যাকে আমি এত ভালবাসি সে আমাকে এরকম... মানে..."

অদিতি চুপ করে বসে কাঁদতে লাগল।

তীর্থ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে চলে গেল।

মিনিট দশেক পরে একটা প্লেট এনে অদিতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল "অমলেট। খেয়ে নাও"।

অদিতি হাতে নিল প্লেটটা।

সমুদ্রের হাওয়া এসে তাদের চোখে মুখে ঝাপটা মারছে। তীর্থ চোখ বন্ধ করে বলল "জিভটা বের করে হাওয়া টানার চেষ্টা কর। দেখবে জিভে নুন এসে লাগবে। আমার বেশ মজা লাগে এটা"।

অদিতি জিভ বের করল।

তীর্থ বলল "এবার আকাশের দিকে তাকাও। দেখো সব তারা দেখা যাচ্ছে। ঐ যে সপ্তর্ষিমন্ডল। কালপুরুষ। কালপুরুষের বেল্টটা দেখো। আমাকে ছোটবেলায় বাবা এই তারা দেখা শিখিয়েছিল। কাল তুমি যখন চলে গেলে, আমি অনেকক্ষণ বসে থেকে তারা দেখছিলাম। অন্য কোন দিকে তাকাই নি। শুধু তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বিশ্বাস করবে না আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন টাইম ট্রাভেল করছি। যেন সেই ছোটবেলায় ফিরে গেলাম। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখো"।

অদিতি আকাশের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করল।

তীর্থ বলল "তুমি ছোটবেলায় ফিরতে চেষ্টা কর অদিতি। মাঝের সময়টাকে ডিলিট করে দাও বরং মাথা থেকে। ডিলিট করা কঠিন আমি জানি, তবু চেষ্টা কর। একদিন না একদিন বেরোবেই। পৃথিবীর দু একজন পুরুষের জন্য সব পুরুষ খারাপ হয়ে যায় না জানো তো? সব কিছুর এত সরলীকরণ করলে হবে? এই পুরুষ যেমন ধর্ষণ করে, এই পুরুষই কিন্তু ধর্ষিতাকে রক্ষা করে। যে ছেলেগুলো ওখানে কাঁকড়া বিক্রি

করছিল, যাদের তুমি এত ভয় পেলে, ওদের কথা শুনেছো? তিলতিল করে টাকা জমিয়ে ওরা একটা ঘর বানিয়েছিল। একটা ফণী এল, সব হারিয়ে গেল ওদের। কোনমতে প্রাণে বেঁচে আবার শূন্য থেকে শুরু করল। সরকারি ত্রাণ এখনও এসে পৌছয়নি। কাঁকড়া, ঝিনুক ভাগে চাষ করে জীবন কাটায়। আমাদের গোটা নৌকোটা আঠেরোশো টাকা ভাড়া নিয়েছে যারা, তারা মাঝিকে সারাদিনে মাত্র একশো টাকা দেয়। মাঝির মেয়ে ক্লাস ফাইভে পড়ে। আমরা এদের শুধু পুরুষ হিসেবেই দেখব? এরাও মানুষ। সিজনে ক'টা টাকার জন্য এরকম জীবন কাটাচ্ছে। তোমার ভয়ের কারণটা বুঝেছি, কিন্তু সব সময় গুটিয়ে থাকাই কি জীবন? বেরনোর চেষ্টা কর। আমি জানি তুমি পারবে"।

অদিতি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে বলল "তুমি আমাকে ঘেন্না করছ?"

তীর্থ বলল "ধুস! ঘেন্না করার কী আছে? একটা ফালতু ছেলের জন্য একটা মেয়ে খারাপ হয়ে যাবে? এত সোজা নাকি? হতে পারি আমি সেলফিস ছেলে, কিন্তু এই মিনিমাম বোধটা বোধ হয় আমার আছে। আর ইয়ে, অমলেটটা ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু ভাল লাগবে না"।

অদিতি চামচ দিয়ে অমলেটটা কেটে কেটে খেতে শুরু করে বলল "তুমি খাবে না?"

তীর্থ বলল "খাব। তুমি তখন আমাকে দেখে নৌকো থেকে নেমে যেভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে শুরু করলে আমার পেট ভরে গেছে"।

অদিতি চামচটা ছুরির মত তীর্থর গলায় ধরে বলল "বার বার এবার এই কথাটা তুললে একদম মেরে ফেলে দেব কিন্তু। আমার তখন ভয় লেগেছিল"।

তীর্থ হাসতে হাসতে বলল "হ্যাঁ বুঝেছি তো। কত বীরাঙ্গনা দেখলাম আজ"।

অদিতি গম্ভীর হয়ে বলল "আমায় অমলেট খেতে দাও। অমলেট খাবার সময় ফালতু বকা আমার ভাল লাগে না"।

তীর্থ বলল "বলছিলাম কী, আমার না এই চুক্তির বিয়ে টিয়ে আর পোষাচ্ছে না। একটা এক্সপেরিমেন্ট করাই যায় কী বল?"

অদিতি জিজ্ঞাসু চোখে বলল "কী রকম?"

তীর্থ বলল "এই যে, মানে সংসার করলে কেমন হয়। ধর একজন সেলফিস ছেলে, মানে তোমার কথা অনুযায়ী, আরেকজন দাগা পাওয়া মেয়ে... মন্দ হয়?"

অদিতি একটু ভাবার ভান করে বলল "শর্ত আছে একটা"।

তীর্থ বলল "কী?"

অদিতি বলল "সুপর্ণার ব্যাপারে আমি লেগ পুল করতে পারব, তুমি কিন্তু সাগ্নিককে নিয়ে আমার লেগপুল করতে পারবে না"।

তীর্থ অসহায় ভঙ্গিতে বলল "মাইরি এ কেমন শর্ত? মানে লেগপুল না করলে হবে না?"

অদিতি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল "না হবে না। আমার লেগপুল করতে হেব্বি লাগে। আর হ্যাঁ, হানিমুনে এসে প্রথমবারে অমলেট একা একা মেরে দেওয়াটা নিয়ে তো সারাদিন কথা শোনাব"।

তীর্থ ছদ্ম ক্ষোভে বলল "ঠিক আছে"।

অদিতি একটু চুপ করে থেকে হি হি করে হেসে বলল "মাইরি কত নাটক! চুক্তির বিয়ে, এই বিয়ে, সেই বিয়ে, শেষে ঘুরে ফিরে সেই থোড় বড়ি খাড়া বিয়েই হয়ে গেল"!

তীর্থ অদিতির একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে সিরিয়াস মুখে বলল "আমার একটাই দাবী"।

অদিতি গম্ভীর হয়ে গেল "কী? আবার কী দাবী?"

তীর্থ ফিক করে হেসে বলল "আজ আবার তুমি বিয়ার খেও। ঠিক আছে?"

অদিতি তীর্থর হাতে চাপ দিয়ে বলল "ধ্যাত!"

সমুদ্রের জল বাড়ছে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তীরে।
হোটেলে তারা আজ একটু তাড়াতাড়িই ফিরল।
ডিনার দিতে এসে ছেলেটাও ফিরে গেল।
দরজার ভেতরে কী হল, সেসব আর জেনে কাজ কী?
আমরা বরং আমাদের কাজ করি।
কী বলেন?

গুরুপ্রণামী

আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

আকাশে অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

মেঘ। সূর্য। কখনও প্লেন।

আমি খুঁজছিলাম টাকা।

টাকা দরকার।

মাসের শেষ, টাকা একেবারেই হাতে নেই।

বাসে ওঠার আগে পর্যন্ত দশবার চিন্তা করতে হচ্ছে। টাকা না থাকলে যা হয়।

কোথাও যাবার হলে হেঁটেই মেরে দিচ্ছি।

হন্টন শিল্পে খুব শিগগিরি বঙ্গ বিভীষণ টাইপের কিছু পেয়ে যেতে পারি।

রুবির মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা বাসের দিকে তাকিয়ে পকেটে অবশিষ্ট টাকার সঙ্গে বাস ভাড়ার জটিল ক্যালকুলেশন করতে করতে ঘেমে যাচ্ছিলাম এমন সময় দেখি একটা বিরাট গাড়ি এসে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দৈব বাণীর মত কোন একটা মেয়ের গলায় শুনতে পেলাম "এই অয়নদা। গাড়িতে ওঠো শিগগিরি"।

আমি গাড়ির দিকে নজর দিলাম।

ওরে বাবা, এ তো গাড়ি নয়, দেবতা নিশ্চয়। নারী কণ্ঠের মালকিনকে অবশ্য চিনলাম। অহনা বসু। জুনিয়র। একদিন এসে খুব কায়দা করে বলেছিল টিউশন পড়তে চায়। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলেছিলাম প্রতিটা সেমিস্টার পাশ করার পর আমি আগের সেমিস্টার ভুলে যাই। টিউশন তো দূর কী বাত।

অহনা তাও বেশ কয়েকবার ঘ্যান ঘ্যান করেছিল।

আমি না-য়ে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে মুখ টুখ বাঁকিয়ে চলে গেছিল।

এখন এরকম ডাক শুনে আর রিস্ক নিলাম না।

পকেটে টাকা নেই।

লিফট পেলে মন্দ হয় না।

গাড়িতে উঠে পড়লাম। হেব্বি ঠান্ডা গাড়ি। নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে এরকম জোরে এসি চলছে। ড্রাইভার আমাদের ক্লাসের সব থেকে গম্ভীর স্যার এস ডিজির থেকেও গম্ভীর মুখে গাড়ি চালাচ্ছে। সামলে সুমলে বসতে না বসতেই অহনা বলল "কোথায় যাবে?"

আমি বললাম "পাটুলি। তুই কোথায় যাবি?"

অহনা বলল "সল্টলেক"।

আমি বললাম "যাব্বাবা, আমি তো তোর উল্টোদিকে যাব। জিজ্ঞেস না করেই গাড়িতে তুললি?"

অহনা ড্রাইভারকে "ও রাজীবদা পাটুলি চল তো", বলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল "এই তো, পাটুলি যাচ্ছি। হল?"

আমি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে বললাম "বাঁচালি, কালকেও রুবি থেকে পাটুলি হেঁটে গেছি। পায়ের ব্যথা কমে নি এখনও"।

অহনা অবাক হয়ে বলল "কী? ঢপ মারার জায়গা পাও না?"

আমি বললাম "মাইরি বলছি বিশ্বাস কর। বনগাঁ লোকালের দিব্যি। টাকার অভাব যাচ্ছে"।

অহনা বলল "সত্যি তুমি রুবি থেকে পাটুলি হেঁটে গেছ?"

আমি বললাম "সত্যি। সত্যি। সত্যি। হল?"

অহনা কপালে হাত টাত দিয়ে বলল "ভাবা যাচ্ছে না। আজকেও তাই যেতে নাকি?"

আমি বললাম "দেখ আজকে কুড়ি তারিখ। পকেটে সাড়ে তিনশো টাকা আছে। এর মধ্যে একদিন মেসের বাজার করতে হবে, আড়াইশো থেকে তিনশোটাকার ধাক্কা। বাকি পঞ্চাশটাকায় বাস ভাড়া টায়ে টায়ে হয়ে যেতে পারে কিন্তু এর মধ্যে যদি কোন কারণে কোন কেলো হয়ে যায় তবে গেলো"।

অহনা বলল "বাবা! কত হিসেব!"

আমি বললাম "গরীব আদমি। বুঝতেই পারছি"।

অহনা মাথা নাড়িয়ে বলল "হু। সে তো বুঝতেই পারছি। সেই জন্যই তো বলেছিলাম টিউশন পড়াতে। হাত খরচা উঠে যেত। এভাবে হাঁটতে হত না"!

আমি আঁতকে উঠে বললাম "রক্ষে কর। পারলাম না"।

অহনা রেগে গেল। রেগে গেলে অহনা লাল হয়ে যায়।

বলল "কেন পারবে না কেন? তুমি জানো আমার একটা ভাল টিউটর নেই?"

আমি বললাম "ক্লাস কর না মন দিয়ে। ক্লাস করলে টিউটর লাগে না। আমার তো কোন টিউটর নেই"!

অহনা বলল "হুহ। তুমি তো ব্রিলিয়ান্ট। সবাই তোমার মত বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকতে পারে নাকি"!

আমি বললাম "ছাতার ব্রিলিয়ান্ট। আমার কোন কাজ নেই, পকেটে টাকা নেই, তাই ক্লাস করতে হয়। বাপ দিত একগাদা হাত খরচ, আমিও ঘুরে বেড়াতাম"।

অহনা বলল "ভাল হয়েছে দেয় নি। মানুষ হবে। আমার মত বখে যাবে না"।

আমি বললাম "তুই বখে গেছিস? কোই দেখে তো মনে হচ্ছে না!"

অহনা মজা পেল আমার কথা শুনে। হেসে বলল "দেখে বলে দিতে পারো কে বখে গেছে আর কে বখে যায় নি?"

আমি বললাম "হ্যাঁ, না পারার কী আছে"।

অহনা বলল "তাহলে বল আমি কেমন মেয়ে"।

আমি বললাম "চমৎকার মেয়ে। তবে হেড অফিসে একটু ডিফেক্ট আছে"।

অহনা রেগে গেল "কেমন ডিফেক্ট"?

আমি বললাম "এই যে সল্টলেকে বাড়ি আর আমাকে নামাতে পাটুলি যাচ্ছিস! ডিফেক্ট না থাকলে কেউ এরকম করে?"

অহনা হেসে ফেলল। বলল "তা ঠিক। তুমি ক পেয়েছো। এক্কেবারে বিশাল ট্যালেন্ট তোমার দেখতে পাচ্ছি মানুষ চেনার"।

আমি বললাম "তবে? দেখলে হবে, খরচা আছে"।

অহনা আবার হাসল।

গাড়ি কালিকাপুর পেরিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। বেশ জ্যাম। আমি অবাক হয়ে বললাম "কী হয়েছে?"

গাড়ির ড্রাইভার বলল "মিছিল যাচ্ছে কিছু একটা। জ্যাম হয়ে গেছে"।

আমি অহনার দিকে তাকালাম "দেখলি, কেমন ফেঁসে গেলি তুই"?

অহনা বলল "ফাঁসার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। এই মিছিল যাবে, আবার দেখবে সব নরমাল হয়ে গেছে"।

আমি বললাম "তা ঠিক। শহর মানেই পাগলদের জায়গা"।

অহনা আমার হাতে একটা চিমটি কেটে বলল "মানেটা কী? আমি পাগল?"

আমি বললাম "না না, তুই কেন পাগল হবি? আমি তো বললাম তোর হেডঅফিসটা একটু ম্যালফাংশান করে মাঝে মধ্যে, বাকি সব ঠিকই আছে"।

অহনা গুম হয়ে বসে থেকে বলল "তোমার আর জামা নেই? তুমি এই একটা জামা পরে কলেজ আসো কেন?"

আমি বললাম "আমার দুটো জামা আছে। একই কালারের। ওই জন্য বুঝতে পারিস না"।

অহনা বলল "দুটো জামা একই কালারের কেন?"

আমি বুঝদারের মত মাথা নেড়ে বললাম "ওই তো, সবার চোখে ধুলো দেবার জন্য। লোকে যেন ধোঁকা খেয়ে ভাবে এই দেখো ছেলেটা একই জামা দুবার করে পরছে"।

অহনা মুখে হাত দিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল "বাওয়া, বিরাট ব্যাপার তো। খুব ধুলো দিতে পেরেছো আমাদের মুখে যা হোক"।

আমি হাসলাম "তবেই বোঝ"।

অহনা বলল "আচ্ছা, তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে?"

আমি বললাম "ক্ষেপেছিস? গার্লফ্রেন্ড থাকা মানে কত ঝামেলা জানিস? খরচ দাও রে, টেলিফোন কর রে, সারারাত জানু খেয়েছো, পানু দেখেছ..."

বলেই অহনার দিকে তাকিয়ে জিভ কাটলাম।

অহনা হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল "ঈশ, জঘন্য। তোমাকে যতটা ইনোসেন্ট মনে হয় তুমি একেবারেই তা নও"।

আমি বললাম "আমি? ইনোসেন্ট! কে, কেন, কবে, কীভাবে?"

অহনা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ড্রাইভারের দিকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করে আমাকে চুপ করে যেতে বলে বলল "পাগল দেখেছি, তোমার মত পাগল দেখি নি"।

আমি অহনার ইঙ্গিতে একটু ঘাবড়ে গেছিলাম। কোনমতে সামলে গিয়ে বললাম "আমি নেমে যাব? এখান থেকে হেঁটে চলে যেতে পারব"।

ড্রাইভার বুঝলাম আমার প্রপোজালে খুশি হয়েছে। বলল "নেমে গেলে ভাল হয়। এখনও গাড়ি ঘোরাতে পারব। এরপরে অসুবিধা হয়ে যাবে"।

অহনা কিছু বলার আগেই আমি গাড়ি থেকে নামলাম। গাড়ির লাইন লেগে গেছে রাস্তায়।

আমি অহনাকে টাটা বলতে যাব, দেখি আমাকে অবাক করে অহনাও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে বললাম "কীরে, কী হল?"

অহনা বলল "আমি দেখতে চাই, তুমি সত্যিই এতটা হাঁটো না ঢপ মারো"।

আমি বললাম "আমি তো হাঁটিই, কিন্তু তুই কী চাইছিস? আমার সঙ্গে এতটা হাঁটবি? পারবি?"

অহনা বলল "দেখতেই পাবে! আমাকে ফিজিক্যালি অত আনফিট ভেবো না। যথেষ্ট অ্যাকটিভ আমি। রোজ সকালে পাঁচ কিলোমিটার দৌড়াই মিনিমাম"।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম "বাপ রে, তুই মানুষ, না পিটি উষা?"

অহনা বলল "কেন, পিটি উষা কি মানুষ না? যাক গে, এত ভাটাতে পারছি না। চল হাঁটতে শুরু করি"।

অহনা ড্রাইভারকে বলে দরজা বন্ধ করে আমার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে দিল।

আমি বললাম "কাজটা ভাল করলি না। এবার ফিরবি কী করে?"

অহনা হাত নেড়ে বলল "ফেরার চাপ নিই না। ট্যাক্সি আছে। আরও ভাল ব্যাপার পাটুলিতে আমার ছোটমাসীর বাড়ি আছে। তেমন হলে ওখানে থেকে যাব"।

আমি জোর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বললাম "তাহলে ঠিক আছে। আমার কী! পরের মেয়ে পরমানন্দ, যত গোল্লায় যায়, তত আনন্দ"।

অহনা বলল "হুহ, ওরম বলতে পারলে? আমি তোমার জুনিয়র না?"

আমি মাথা টাথা চুলকে বললাম "তাও ঠিক। জুনিয়রের ওপর তো একটা দায়িত্ব আছেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, তোকে পাটুলি পৌঁছে দেব আমি"।

অহনা খুশি হয়ে বলল "যাক, তাও ভাল। মিনিমাম বোধ বুদ্ধি আছে"।

আমি বললাম "মিনিমাম বোধ বুদ্ধির কী আছে? আমার যথেষ্ট বোধ বুদ্ধি আছে"।

অহনা জোর পায়ে আমার সঙ্গে হাঁটছিল। রাস্তার পাশ দিয়ে মিছিল যাচ্ছে "চলবে না, চলছে না" করতে করতে।

অহনা বলল "মিছিলে হাঁটতে ইচ্ছা করছে"।

আমি বললাম "খেয়েছে। কেন?"

অহনা বলল "এমনি। বাড়ি, কলেজ করতে করতে বোর হয়ে গেলাম"।

আমি বললাম "ও। তা ভাল। চ মিছিলেই ভিড়ে যাই, বেশ একটা এনার্জি পাওয়া যাবে"।

দুজনে মিছিলে ভিড়ে গেলাম।

মিছিলের লোকজন আমাদের দেখে একটু ব্যোমকে গেল কিন্তু কিছু বলল না।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর অহনা বলল "একটু দাঁড়াবে?"

আমি বললাম "এই যে বললি তুই সকালে দৌড়স?"

অহনা রাস্তার কোণায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলল "আমি ক্লান্ত হই নি। মিছিলটাও বোর লাগছে এবার। চলে যাক ওঁরা"।

আমি আবার দাঁড়িয়ে গেলাম। মিছিলের লোকগুলো আমাদের দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টি দিতে দিতে "চলবে না, চলছে না" বলতে বলতে চলে গেল।

খানিকক্ষণ পরে আবার হাঁটতে শুরু করলাম আমরা।

অহনা বলল "অজয়নগরে রোল খাব, ঠিক আছে?"

আমি বললাম "টাকা নেই যে"।

অহনা বলল "আমার আছে তো। মাসের শুরুতে দিয়ে দেবে"।

আমি বললাম "আচ্ছা। তাই হোক। অজয়নগরের রোল ভাল জিনিস। স্বর্গে সেসব পাওয়া যায়। অবশ্য তোরা বড়লোক। স্বর্গীয় জিনিস টাকা ফেললেই পেয়ে যাস"।

অহনা বলল "ছাই। বাড়িতে আমার অনেক রেস্ট্রিকশন। অবশ্য রোল ইচ্ছা করলে খেতেই পারি"।

দুজনে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে হাঁটতে লাগলাম।

অহনা বলল "এই তুমি সিরিয়াসলি হাঁটছ দেখছি। তোমার হাঁটা দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তুমি হাঁটো। রিয়েলি! আই অ্যাম ইমপ্রেসড"!

আমি বললাম "গ্রামের লোকেদের কাছে হাঁটাটা বড় কথা না। অবশ্য এই সব রাস্তায় হাঁটা হেকটিক কারণ গাড়িগুলো হুশ হুশ করে বেরিয়ে যায়। পলিউশনও আছে। আমাদের ওখানে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম তো আমরা হেঁটে বা সাইকেল করেই চলে যাই। এমন কিছু কষ্ট হয় না"।

অহনা বলল "হ্যাটস অফ। সত্যি। কিছু বলার নেই। আচ্ছা,তোমার সঙ্গে কেন হাঁটছি জানো?"

আমি বললাম "যাতে বুঝতে পারিস আমি সত্যিই হাঁটি কিনা?"

অহনা দু দিকে মাথা নেড়ে বলল "একেবারেই না। অ্যাকচুয়ালি তোমাকে বোঝাতে যে তোমার থেকে টিউশন নিতে আমি কতটা সিরিয়াস"।

আমি অহনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বললাম "বাপ রে। কী চাপ রে!"

অহনা গম্ভীর গলায় বলল "হ্যাঁ, সত্যিই ভীষণ চাপ। তুমি না পড়ালে তোমার ঘাড়ে উঠে ঘাড় মটকাব। আমাকে চেনো না তুমি"।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম "আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব। কিন্তু ছাত্রী ফেল করলে যেন আমার দোষ না হয় আগে থেকে বলে রাখলাম"।

অহনায় হেসে বলল "একদম। ছাত্রী ফেল করলেও মাস্টার বেকসুর খালাস পাবে। ওয়াদা হে মেরা"।

আমরা অজয়নগর এসে গেছিলাম। একটা রেস্তরাঁয় ঢুকলাম।

চেয়ারে বসে অহনা হাঁফ ছেড়ে বলল "উফ। সত্যিই। ইউ আর জিনিয়াস। মানতেই হচ্ছে"।

আমি হাসলাম "তা বটে"।

অহনা বলল "কিন্তু এখান থেকে পাটুলি তোমাকে আমার সঙ্গে রিক্সায় যেতে হবে। আমি আর হাঁটতে পারছি না"।

আমি ব্যাজার মুখে বললাম 'অভ্যেস খারাপ করে দিচ্ছিস"।

অহনা বলল "হোক অভ্যেস খারাপ। একদিন রিক্সায় গেলে কিছু হয় না"।

আমি আর কী বলব। চুপ করে বসে থাকলাম।

রেস্তোরার বয় এসে অর্ডার জানতে চাইলে অহনা যেই রোলের কথা বলেছে বয় জানাল টেবিলে রোল সার্ভ হয় না।

অহনা রেগে মেগে এক গাদা খাবার অর্ডার করে দিল।

আমি ভিরমি খেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম "একী করলি তুই! আমার মাসের বাজেটটাই তো অর্ডার করে দিলি"।

অহনা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল "আচ্ছা তুমি চাপ নিচ্ছো কেন! টিউশন দেবে বলে রাজি হয়েছ তার প্রণামী ভেবে নাও না"।

আমি হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। টাকা থাকলে লোকে কত কিছু করতে পারে।

খানিকক্ষণ পরে অহনা ওর ব্যাগ থেকে একটা জামা বের করে আমায় দিয়ে বলল "এটা পরবে। তোমার কালার কন্সেপ্টের কথা আগে জানলে একই কালারের জামা দিতাম। কেনা হয়ে গেছে। কিছু করার নেই। দয়া করে পরে আমাকে উদ্ধার কোর"।

আমি আর অবাক হলাম না। লোকে অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর হয়। আমি অধিক শকে পাথর হয়ে গেছিলাম।

বললাম "এটা কখন কিনলি?"

অহনা বলল "পুজোয়। কেনার পর থেকে ব্যাগে নিয়ে ঘুরছি। রোজ ভাবি দেবো। দেওয়া হয় না"।

আমি বললাম "কেন কিনলি?"

অহনা মাথায় হাত দিয়ে বলল "ওই যে ঘুষ। গুরু প্রণামী আর কী। বুঝেছ?"

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম "পড়ার জন্য কেউ জামা পরাতে পারে এই প্রথম দেখলাম আমি। লহ প্রণাম"!

অহনা ফিকফিক করে হাসতে লাগল।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইলাম।

#

সাত বছর পরের কথা।

অফিসের কাজে নিউ ইয়র্ক যাব। ফ্লাইটে বসে আছি।

অহনা বুবুনকে আমার কোলে দিতে দিতে দাঁত খিচিয়ে বলল "ধর না বাচ্চাটাকে একটু। সারাক্ষণ মায়ের কোলেই থাকবে মেয়েটা"?

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেদিনের অহনার সঙ্গে এদিনের অহনার মনে মনে তুলনা করতে করতে ফিকফিক করে হাসতে থাকলাম।

অহনা রেগে বলল "কী হল আবার? হাসছ কেন?"

আমি বললাম "কিছু না। লহ প্রণাম"।

অহনা আমার পেটে একটা খোঁচা মেরে বলল "মরণ!"

বিশ্বাসঘাতক

১

রান্না করছিল ঝিলম।

রান্নাঘরের জানলার সামনে দিয়ে বাইকটা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ঝিলমের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল।

সেই ছেলেটা।

এর আগেও তাকে ফলো করেছে।

সাত্যকি অফিসে। প্রথমে একবার ভাবল ফোন করে। তারপরে ঠিক করল এখন ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না।

ছেলেটার চাউনি ভাল না।

ঝিলম রান্নাঘরের জানলা বন্ধ করল।

২

।।পূর্ব কথা।।

"আমি প্রেগন্যান্ট"।

ঝিলমের গলা ধরে এল।

সাত্যকি বুঝতে পারছিল না কী করবে। বলল "তবে কী করব? বিয়ে করে নি?"

ঝিলম বলল "তুমি যা বলবে"।

সাত্যকি বলল "বাড়িতে বলেছ?"

ঝিলম বলল "এ কথা বাড়িতে বলা যায়? তোমার কী মনে হয়?"

সাত্যকি বলল "ঠিক আছে। বলার দরকার নেই। আমি তো অনাথ পাবলিক। আমার তো আর বাড়ির ঝামেলা নেই। তুমি আমার এখানে চলে এসো। রেজিস্ট্রি করে নিচ্ছি। তোমার বাবা মাকে চিঠি লিখে দিও বরং"।

ঝিলম মাথা নিচু করে বসে রইল।

সেদিনই তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

৩

সাত্যকি অফিসে গেলে সারাদিনটা শুয়ে বসে কেটে যায় ঝিলমের। সকালটাই যা দৌড়াদৌড়ি থাকে। সাত্যকির ফিরতে রাত হয়।

বিকেলবেলা বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটে।

সেদিনটাও এমনই হাঁটছিল।

একটা বাইক হঠাৎ করে যেন তার খানিকটা গাঁ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। বাইকে বসা ছেলেটার হেলমেট ছিল না। মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিয়ে চলে গেল।

ঝিলমের কান মাথা ঝিঁঝিঁ করছিল। এরকম কলকাতায় কখনও হয় নি তার সঙ্গে। সাত্যকিও নেই। সে তড়িঘড়ি ঘরে ঢুকে গেল।

সাত্যকি এল সাতটা নাগাদ। চা দিয়ে সাত্যকির সামনে বসল।

সাত্যকি বলল "তোমার ব্লাড টেস্টের ডেট দিয়েছে। করে নিও"।

ঝিলম বলল "আজ একটা ঘটনা ঘটেছে"।

সাত্যকি বলল "কী?"

ঝিলম বলল সবটা।

সাত্যকি চুপ করে শুনল। বলল "অনিচ্ছাকৃত হতে পারে। তুমি বেশি ভাবছ হয়ত"।

ঝিলম বলল "জানি না"।

পরের দিন বিকেলে অন্য ঘটনা ঘটল। সে বেরোয় নি। ছেলেটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। জানলা দিয়ে সবটা দেখল ঝিলম। একটা অজানা ভয় তাকে গ্রাস করল।

সাত্যকি এবারে শুনে বলল "ঠিক আছে। তুমি এখন বেরিও না। তোমার মাকে আসতে বল। ক'দিন থেকে যান"।

৪

ঝিলমের মা আসতে পারলেন না। বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজো আছে। ঝিলম জোর করতে পারল না।

দুদিন ছেলেটাকে দেখাও গেল না।

ঝিলম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সাত্যকির সঙ্গে যতদিন কলকাতায় প্রেম করেছে, বিভিন্ন হোটেলে মিলিত হয়েছে, তখন এ ভয়টা ছিল না।

এ জায়গাটাই এরকম। নির্জন। মানুষগুলোও ভারি অদ্ভুত। এলাকার লোকেরা ভাবে বাবুরা চাকরি করতে এসে যেন দখল করে নিয়েছে তাদের জমি। প্রায়ই কিছু না কিছু সমস্যা তৈরি হয়।

ডাক্তারবাবু বলেছেন খুব সাবধানে থাকতে হবে। মন খারাপ করলে চলবে না। অথচ এই ছেলেটার যাতায়াত তাকে টেনশনে ফেলে দেয়।

বিকেলে একটা সময় অসহ্য লাগছিল।

ঝিলম বেরোল। ঠিক করল বাড়ির সামনের রাস্তাটা একবার হেঁটে ঘরে ঢুকে যাবে।

জায়গাটা ওড়িশা। বোলাঙ্গির শহর। ছোট কলোনি শহর। সেরকম দোকান বাজারও নেই। জিনিসপত্র কিনতে অফিসের ক্যান্টিন ভরসা। গরমে প্রচন্ড গরম পড়ে।

রাস্তা নতুন করে তৈরী করা হয়েছে। ঝকঝকে পিচের রাস্তা। শুধু লোক নেই।

ঝিলম অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। লক্ষ্য করে নি কখন বাইকটা চলে এসেছে। হঠাৎ করে তার পেটে হাত দিয়ে জোরে বাইক চালিয়ে ছেলেটা বেরিয়ে গেল।

ঝিলম হতভম্ব হয়ে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তারপরেই চিৎকার দিল একটা। ছেলেটা অনেকটা চলে গেছিল। মোড়ের মাথায়। বাইক দাঁড় করিয়ে দিল। তার দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে উঠল। পরক্ষণে বাইকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

চারপাশে কেউ নেই। ঝিলমের কান্না পেয়ে গেল।

৫

সন্ধ্যে ছ'টা বেজেছে। ঘরেই বসেছিল চুপ করে ঝিলম।

বাইরে দু তিন বার জোরে হর্নের শব্দ পেয়েছে। জানলা দিয়ে দেখেছে ছেলেটা যাতায়াত করছে আর তাদের বাড়ির সামনে হর্ন দিচ্ছে। ঝিলম প্রথমে ঠিক করল সাত্যকিকে বলবে। পরক্ষণে মনে হল অফিস ফেরতা টেনশন দেবে না। দরজায় তালা দিয়ে বসে থাকল।

রাত আটটা নাগাদ কলিং বেল বাজল। সাত্যকির গাড়ির গ্যারেজে ঢোকার শব্দ এল।

ঝিলমের তবু বিশ্বাস হল না। সে চ্যাচাল "কে?"

সাত্যকি বলল "আমি, দরজা খোল"।

ঝিলম দরজা খুলল। সাত্যকি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল "কী ব্যাপার, তালা টালা দিয়ে বসে আছো। জিজ্ঞেস করছ কে, কী হয়েছে?"

ঝিলম দেখল ছেলেটা তখনও বাড়ির বাইরের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাইক নিয়ে। বলল "ভেতরে এসো, বলছি"।

সাত্যকি বলল "কী হয়েছে, এখানেই বল"।

ঝিলম বলল।

সাত্যকি বলল "এক মিনিট, দাঁড়াও"।

ঝিলম দেখল সাত্যকি হনহন করে বেরিয়ে গিয়ে গ্যারেজ থেকে আবার গাড়ি বের করল।

কয়েক মিনিট পরে বিস্ফারিত চোখে দেখল ছেলেটাকে প্রবল জোরে ধাক্কা মারল সাত্যকির গাড়ি। ছেলেটা কাতরাচ্ছে রাস্তায়। সাত্যকি গাড়ি ব্যাক করে আবার ধাক্কা মারল। ছেলেটা এবার আর কাতরাল না। চুপ করে গেল।

ভয়ে ঝিলম চারদিক তাকাল। সব কোয়ার্টার ফাঁকা। এদিকে এখনও কেউ আসে নি।

সাত্যকি গাড়ি নিয়ে এসে গ্যারেজে রেখে পাইপ দিয়ে গাড়িতে জল ছিটিয়ে আধ ঘন্টা পর ঘরে এসে বসে বলল "ঠিক আছে?"

৬

বোলাঙ্গির খরাপ্রবণ এলাকা। হঠাৎ করে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়াটা অবাক করার মতই ব্যাপার।

বৃষ্টি নেমেছে অঝোরে। সাত্যকি মোবাইল ঘাটছিল। সাত্যকির সামনে হতভম্ব হয়ে বসেছিল ঝিলম।

সাত্যকির খেয়াল হল "আরে, টিভি ফ্রিজের প্লাগগুলো খুলবে না?"

ঝিলম বলল "হ্যাঁ, খুলে দিচ্ছি"।

ঝিলম তড়ি ঘড়ি প্লাগগুলো খুলল। সাত্যকি বলল "চা দিও। আর মুড়ি"।

ঝিলম বলল "পুলিশ আসবে না?"

সাত্যকি বলল "আসলে আসবে। তুমি চিন্তা কোর না। আমি বুঝে নেব"।

ঝিলম বলল "তুমি হঠাৎ করে মেরে দিলে? আমি তো ভাবতেও পারি নি"।

সাত্যকি বলল "ধুস, এটা তো সোজা ছিল। আমাদের পাশের বাড়ির ধীরেন কাকা সেই কাঠাল নিয়ে ঝামেলা করছিল মনে আছে? বাজার থেকে ফিরছিল, মাথায় আধলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে দিয়েছিলাম। এই তো, দু বছর আগের কথা। রাস্তায় পড়েছিল। পুলিশ এখনও সে কেসের কিনারা করতে পারে নি"।

ঝিলম হাঁ করে সাত্যকির দিকে তাকিয়ে রইল।

৭

বৃষ্টি কমেছে। পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে জায়গাটায়।

ঝিলম জানলা দিয়ে দেখছিল। বাইকটা একইভাবে স্ট্যান্ড করা আছে। সাত্যকি খবরের কাগজ পড়ছে মন দিয়ে। দুজন পুলিশ তাদের বাড়ির দিকে আসছে। ঝিলম জল খেল।

বুক ধড়ফড় করছে তার। কলিং বেল বেজে উঠল।

সাত্যকি বলল "আমি দেখছি। তুমি বাইরে বেরিও না। বেরোলে ছড়িয়ে ফেলবে"।

ঝিলম ডাইনিং টেবিলে বসল।

পুলিশ দুজন ঘরের ভেতর ঢুকল।

সাত্যকিকে দেখে বলল "ওহ সাহেব, আপনি এদিকে থাকেন?"

সাত্যকি হাসল "হ্যাঁ। মেইন সিটির দিকে কোয়ার্টার পাবার চেষ্টা করছি। দেখি কবে পাই"।

অপর পুলিশের গলা শোনা গেল, "আপনি ওদিকে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। এদিকটা ভাল না। আজ একটা মার্ডার হয়ে গেল কিছুক্ষণ আগে। আপনার বাড়িরই সামনে"।

সাত্যকি অবাক গলায় বলল "সেকী! আমি তো অফিসে থেকে এসে কাগজ পড়ছিলাম। সেরকম কিছু বুঝলাম না তো!"

"সেটাই স্বাভাবিক। তবে যে ছেলেটা মরেছে, উঠতি গুন্ডা ছিল। গ্যাং ওয়ারে মরেছে যা বোঝা যাচ্ছে। দুটো গোষ্ঠী তো আছেই জানেন এটুকু শহরে। সকালেও এদের মধ্যে মারামারি চলছিল। পেয়েছে রাস্তায়, চাপা দিয়ে দিয়েছে আরকী! যাই হোক, আপনি সাবধানে থাকবেন স্যার। আমরা গাড়ি নিয়ে টহল দেব রাতের দিকটা, ভয় নেই"।

সাত্যকি বলল "প্লিজ অফিসার। দিনের বেলা আমি অফিস যাই, তখন ওয়াইফ একা থাকে। ওই সময়টাও পারলে একটু দেখবেন। ভয়ের ব্যাপার তো। আমি ট্রান্সফার নিয়ে নেব, এখানে থাকা তো খুব রিস্ক হয়ে যাচ্ছে। বাই দ্য ওয়ে, চা খাবেন?"

"নাহ। কাচরা সাফ করি। পরে খাওয়া যাবে না হয়। বাই স্যার"।

"বাই অফিসার"।

পুলিশ দুজন বেরিয়ে গেল।

সাত্যকি দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে বলল "তোমার আর টেনশন নেই তো?"

ঝিলম বলল "তুমি ক'টা খুন করেছ এখন অবধি?"

সাত্যকি বলল "তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন বলতো? আমি কি পেশাদার খুনী নাকি? সমস্যা হলে দেখি। আবার ব্যাক টু নরমাল লাইফ। আচ্ছা শোন, ডাক্তারবাবু কিন্তু বলেছিলেন তোমাকে কোন টেনশন না করতে, মনে আছে তো?"

ঝিলম ফ্যাকাসে হাসল।

৮

বৃষ্টি হওয়ায় গরমটা কমেছে।

সাত্যকি আর ঝিলম খেতে বসেছে।

ঝিলম খেতে পারছে না। সাত্যকি বলল "সব কিছু নিয়ে এত কমপ্লিকেসি আসে কেন তোমার? ভয় পাচ্ছো কেন? তুমি ভাবো না, ছেলেটা যেভাবে বাড়াবাড়ি শুরু করছিল, কোন দিন ঘরে ঢুকে রেপ করে দিয়ে চলে যেত। তখন কী করতে? এখানে আমার যা রেপুটেশন আছে তাতে পুলিশ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না এসব আমি করেছি। এসব জঞ্জাল মাল বাঁচুক, মরুক, কারো যায় আসে না। যেটা করেছি, তোমার জন্যই তো করেছি। আর আমি মানেই তো তুমি। আমরা কি আলাদা বল?"

সাত্যকি ঝিলমের হাতে হাত রাখল।

ঝিলম বলল "এতদিন হয়ে গেল, প্রায় পাঁচ বছর আমরা প্রেম করছি, কোন দিন তো বল নি তুমি এসবও করেছ?"

সাত্যকি বলল "বলার প্রয়োজন ছিল কি? বললে তো ভয় পেতে। ধীরেন পাল আমাকে শুয়োরের বাচ্চা বলেছিল। বাবা মা ছোটবেলায় মারা গেছে, এরকম একটা ছেলেকে শুয়োরের বাচ্চা বলতে দুবারও ভাববে না? পৃথিবীতে সবাই আইন হাতে নেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। আমি জন্মেছি, তুমি মন শক্ত কর"।

ঝিলম ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ছেলেটার মুখটা মনে পড়ছিল। কী কুৎসিত ইঙ্গিত করছিল তাকে। চোয়াল শক্ত হল তার।

বলল "সদর বাজারের ব্লাউজের দোকানদারটা সেদিন আমার সঙ্গে অসভ্যতা করেছিল। তোমাকে বলতে পারি নি। এখন মনে পড়ল"।

সাত্যকি খাওয়া থামিয়ে তার দিকে তাকাল।

৯

খাওয়া হয়ে গেছিল।

ঝিলম বোতলে জল ভরছিল।

সাত্যকি হালকা গলায় বলল "অশোকের সঙ্গে কথা হয় এখন?"

ঝিলমের হাত কেঁপে উঠল, বলল "না তো। কেন?"

সাত্যকি বলল "বাচ্চাটা অশোকের। তাই না?"

ঝিলমের হাত থেকে বোতলটা পড়ে গেল।

সাত্যকি বলল "ভয় পাচ্ছ কেন? ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অ্যাকচুয়ালি আমি জানতাম তুমি ওর সঙ্গেও যেতে। যে যে হোটেলরুমে গেছো সব ক'টার রেজিস্টার আমি দেখেছি। আমি তো প্রোটেকশন ইউজ করতাম। যথেষ্ট কেয়ারফুল ছিলাম। তুমি একদম ক্যারেকটারলেস মাল প্রথম থেকেই জানি আমি। তবু দেখো, প্রেম কী জিনিস, তোমাকে বিয়ে করেও আমি খুশি হলাম"।

ঝিলম মেঝেতে বসে পড়ল।

সাত্যকি বলল "ট্রেনে যাচ্ছিলাম। পাতি ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম অশোককে। তুমি বাড়ি গেছিলে তখন। খবরটা পাও নি। ভালই হয়েছে। বাচ্চা আছে পেটে। এই সময় এই সব খবর বাচ্চার ওপর প্রভাব ফেলে। অবশ্য এখনও ফেলবে। তোমাকে ট্রাই করে যেতে হবে। ভাল থাকার। হাসো হাসো"।

ঝিলম বলল "তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে?"

সাত্যকি বলল "ধুস, মারার কী দরকার, আমার মত একটা পাবলিকের সঙ্গে সারাজীবন কাটাবে। এর থেকে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে। তবে তোমাকে আমি ভালবাসি। ঘেন্না করতে পারি নি। ছেলেটাকে মেরেছি। ব্লাউজের দোকানদারটাকেও মারব। তোমার বাচ্চাটাকে আমার মত খুনী বানাবো। অরণ্যদেবের ছেলে যেমন অরণ্যদেব হয় তেমন। কী হল হাসছ না কেন? হাসো!"

ঝিলম হাসার চেষ্টা করল।

সাত্যকি খুশি হল "এই তো। চল ঘুমিয়ে পড়ি। বেশি দেরী করে ঘুমালে অরণ্যদেবের কষ্ট হবে। হাসতে থাকো, হাসতে থাকো"।

কোয়ার্টারের বাইরে একটা শেয়াল ডেকে উঠল। সাত্যকি শিস দিতে দিতে মশারি টাঙাতে লাগল।

একজন নিঃসঙ্গ মানুষের দিনলিপি

।।প্রথম দিন।।

নিঃসঙ্গতা আশীর্বাদের মত। সঙ্গী যদি অপছন্দের হয় তবে সে সঙ্গ অভিশাপ ডেকে আনে। অশান্তি হয়, কখনও কখনও বলতে না পারলেও মনের মধ্যে যে ঝড় ওঠে, সে ঝড়কে দমন করা বড় কঠিন হয়ে ওঠে।

ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকে থাকেন, তাঁর করুণায় আমি সঙ্গীবিহীন। খানিকটা ভয়েই হোক, খানিকটা বা নিজের ত্রুটিতেই, আমার সঙ্গে আজ থেকে কেউ থাকবেন না। এক নিঃসঙ্গ দ্বীপে, পরিত্যক্ত জাহাজের নাবিকের ন্যায় আমি একা।

আমি, শ্রী অতীন্দ্রনারায়ণ হোমচৌধুরী, আমার নিঃসঙ্গতার দিনলিপির প্রথম দিন নথিভুক্ত করছি এই আধুনিক পৃথিবীতে।

জ্ঞান হবার কিছু দিনের মধ্যেই আমার জন্মদাতার জীবনাবসান হয়। কঠিন রোগে ভুগছিলেন তিনি। পরিবারের যা আয় ইত্যাদি ছিল, তাতে আমার মায়ের আমাকে নিয়ে সংসার চালাতে কোন রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি।

উপযুক্ত শিক্ষালাভের কিছুদিনের মধ্যেই আমার মা আমার জন্য একজন সঙ্গিনী নির্বাচনে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। আমি তাকে নিরস্ত করি এই বলে যে এই মুহূর্তে সংসার ধর্ম পালনের কোন ইচ্ছা আমার নেই। মা নাতি নাতনীর মুখে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি তাকে বোঝাই শুধু মাত্র এই ইচ্ছার জন্য পৃথিবীর কত পরিবার যে বিনষ্ট হয়েছে তার হিসেব মেলা ভার।

মা আমার কথায় যে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তা নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ গত কাল বাড়ির বাগানের খরিশের কামড়ে মার মৃত্যু হয়।

মাকে দাহ করে আসার পর আমি আবিস্কার করি, এই পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।

আমি একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তি।

অপরদিকে একজন স্বাধীন ব্যক্তিও বটে।

এই নিঃসঙ্গতা এবং স্বাধীনতার টানাপোড়েনে আগামীদিনে কে জয়ী হয়, খানিকটা সে তথ্যাবলী নথিবদ্ধ করতেই আমার এই ডায়েরী লেখার সূত্রপাত।

।। দ্বিতীয়দিন।।

… রাত্রি এগারোটা…

“ভালবাসার নামে ব্যবহৃত হতে নেই…”

জীবনের সব থেকে বড় শিক্ষা দিয়েছিলেন আমাকে আমার এক শিক্ষক। তিনিও নিঃসঙ্গ ছিলেন। আমাকে বলেছিলেন নারীর চোখের ছলনায় ভুলে যাওয়ার মত ভুল করে যারা তারা মস্তিষ্কহীন হয়। উদাহরণস্বরূপ আমাকে অনেক কিছু বলেছিলেন। আমি তার সব মনে করে নথিভুক্ত করতে পারছি না। তার পরিবর্তে অন্য কথা বলি।

শোকস্তব্ধ মন। অনাথ এবং একলা থাকার কথা ভেবে খানিকটা দুঃখী হয়েই বসে ছিলাম বিকেল নাগাদ। অশৌচের সময়। পরিজনের ভিড় লেগেই রয়েছে।

এর মধ্যেই মাসী এলেন। মায়ের থেকে ছোট। মা তাকে কন্যাস্নেহে দেখতেন।

এ হেন মাসী, তার অগ্রজার কথা না তুলেই আমার বিয়ের কথা বললেন। এত বড় বাড়ি কে দেখবে, ইত্যাদি বলে গেলেন। আমি শুনলাম, প্রতিবাদ করলাম না।

মাসী একটি মেয়ের ফটো দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন আমি যেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমি ফটোটি না দেখেই টেবিলে রেখে দিয়েছিলাম।

রাতে হবিষ্যি খাবার পরে আমি ছবিখানি দেখলাম।

আর একখানি কাগজে মেয়েটির নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার লেখা। আমি কাগজখানি দেখে কালকের কথা স্মরণ করলাম। আপাতত নিঃসঙ্গ জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার কোন রকম ইচ্ছা না দেখিয়ে ছবি এবং কাগজখানি যেমন ছিল তেমন রেখে দিলাম।

।।তৃতীয় দিন।।

…রাত্রি সাড়ে দশটা…

মোবাইল ফোন নামক বস্তুটি পৃথিবীতে কবে এবং কেন এসেছিল তা সবাই জানেন। আমি কোন দিন জানার চেষ্টা করি নি। কিন্তু ডেটা প্যাক একটি বিষম বস্তু, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ফেসবুক ইত্যাদিতে আমি কোনদিনই খুব একটা সড়গড় ছিলাম না। অফিসের কাজে ব্যস্তও থাকতে হয়, যার ফলে সোশ্যাল নেটওয়ারকিং এ আমি বরাবরই কাঁচা। সমস্যা বাধল অন্য জায়গায়। আমার পিসির মেয়ে পিম্পি বরাবরই বড্ড জ্বালাতন করে আমায়, ভালোও বাসে। পিসি, পিসে এবং পিম্পি এসেছিল আজ সকালে।

পিম্পি কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। এসে আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদল পিসি। পিম্পি আমার আলমারি পরিষ্কার করে দিল এবং যেটা চাই নি, সেই অনভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটে গেল।

পিম্পির হাতে মেয়েটির ফটো চলে গেল। পিম্পি চিন্তিত মুখে ছবিখানি দেখে আমায় জানাল “দাদা, এই মেয়েটাকে না আমার খুব চেনা চেনা লাগছে, এর সাথে কি তোর বিয়ের কথা চলছে?”

আমি বললাম “ধুস, খেপেছিস? আমি এখন বিয়ে টিয়ে করব না। মাসী দিয়ে গেল এই ছবিটা। আমার কোন ইচ্ছা নেই”।

পিম্পি খানিকক্ষণ তার মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি করে আমায় মেয়েটার একটা ছেলের সাথে ছবি বের করে দিয়ে বলল “এই দেখ, এই মেয়ে তো অলরেডি এনগেজড। হ্যাঁ করে দিস নি তো?”

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম। পিম্পি আশ্বস্ত হল।

ওরা সব চলে গেলে আমি সন্ধ্যে থেকে ফেসবুক রহস্য উদ্ধারে সচেষ্ট হলাম। একখানা অ্যাকাউন্ট খুললাম এবং মেয়েটির প্রোফাইলও খুঁজে পেলাম। ছবিটা আমিও দেখলাম।

আমার রাগ হল। ভাবলাম মাসীকে ফোন করে বকাঝকা করি।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালাম।

।।চতুর্থ দিন।।

লিখলাম বটে চতুর্থ দিন, আসলে কিন্তু চতুর্থ দিন নয়। এর মধ্যে অনেক দিন চলে গেছে। এতদিন ডায়েরী লিখি নি। শ্রাদ্ধ শান্তি, মুন্ডন, মৎস্যমুখ সব শেষ করে লিখছি। কাহিনী অনেক জমে গেছে।

সেগুলো লিখি।

প্রথমে ভেবেছিলাম মাসীকে বলব মেয়ে পছন্দ নয়।

পরের দিন আমি মত পরিবর্তন করলাম। নিঃসঙ্গতা অভিশাপ, আগেই বলেছি, আবার কোন এক গুণীজন বলে গেছেন, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।

এই দুয়ের যৌথভূমিকার ফলেই হয়ত আমি এই দুঃসাহসিক কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

মাসীকে ফোন করলাম এবং বললাম মেয়েটিকে আমার পছন্দ হয়েছে। কথা এগোনো যেতে পারে।

চুল দাড়ি কামানো সম্ভব নয়, সাবানও দেওয়া যাচ্ছে না, তবু তার মধ্যেই মাসী মেয়েটিসুদ্ধ তার পরিবারকে এ বাড়িতে নিয়ে চলে এলেন।

আমাদের পরিবার এককালে জমিদার বংশ ছিল। বিরাট ঘরবাড়ি দেখে তারা যে মুগ্ধ হলেন বলাই বাহুল্য।

এবং যে কাজটি আমি কোনদিন করি নি, মাসী সেই ভয়ানক কাজটি করলেন। একটি আলাদা ঘরে মেয়েটির সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। আধুনিক সময়, পাত্র পাত্রী আলাদা করে কথা বলে নেবে, এখন নাকি এটাই দস্তুর।

গালভর্তি দাড়ি, সাবানহীন মুখ, শ্যাম্পুহীন চুল, পরনে ধরা, আমি একজন আধুনিকার মুখোমুখি হলাম আমার ঘরে।

মেয়েটি সপ্রতিভ। আমার ঘরের চারপাশ দেখে বলল “ভারি সুন্দর আপনাদের বাড়ি”।

হঠাৎ পাওয়া প্রশংসায় আমি কিঞ্চিৎ সংকুচিত হয়ে বললাম “ধন্যবাদ”।

মেয়েটি বলল “আপনার মায়ের এবং বাবার কথা শুনলাম। কেউ নেই আপনার। খুব আনফরচুনেট”।

এবার মুখটা দুঃখী করতে হয় নিয়মানুসারে।

আমি তাই করলাম। মেয়েটি বলল “আপনি কিছু বলুন”।

আমি বললাম “আমার পিতৃপুরুষরা জমিদার ছিলেন। এখন আমি একাই এ সম্পত্তির ওয়ারিশন বলতে পারেন। মাসীমণি আপনার সঙ্গে পরিচয় করার কথা বললেন। আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। আপনার জীবনে কেউ আছে?”

মেয়েটি জোরে জোরে দুদিকে মাথা নেড়ে বলল “একেবারেই নয়। আমি সিঙ্গল। আপনার ঘরের ড্রেসিং টেবিলটা নিশ্চয়ই ইংরেজ আমলের। অসাধারণ। এখানে সাজার মজাই আলাদা”।

মেয়েটির দু চোখ জ্বলে উঠল।

আমি মেয়েটির দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বললাম “তাহলে আমি হ্যাঁ করে দিচ্ছি?”

মেয়েটি খুশি মুখে বলল “নিশ্চয়ই”।

আমি বললাম “চলুন, সবাই অপেক্ষা করছেন”।

মেয়েটি আমার সঙ্গে ঘরের বাইরে এল।

সবাই বসে ছিলেন। মাসী অতিথিদের আপ্যায়ন করলেন। আমি তাদের সঙ্গে হাসি মুখে কথা বললাম। যথাসময়ে তারা চলেও গেলেন।

রাত হল।

আমি ফেসবুকে মেয়েটির প্রোফাইলে উঁকি মারলাম। ছেলেটির সঙ্গে ছবি। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখা করেছে হয়তো।

আমি মেয়েটিকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালাম।

কিন্তু ফেসবুক জানাল মেয়েটির অসংখ্য ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট ঝুলে আছে তাই আর কারো অনুরোধ নেওয়া সম্ভবপর নয়।

অতঃপর আমি আশা ছাড়লাম।

।।পঞ্চম দিন।।

আমরা ছোটবেলায় রচনা পড়েছিলাম বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ।

আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা নিঃসঙ্গতা আশীর্বাদ না অভিশাপ। বড় বাড়ি, রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলা রয়েছে। তার ওপর রয়েছে উটকো আত্মীয়স্বজনের ভিড়। কোন দিন চিনি না, জানি না লোক জন, বাক্স প্যাটরা নিয়ে চলে আসতে লাগল। আমি একা আছি, চিন্তায় তাদের ঘুম হচ্ছে না।

আমি যে এত দুর্মুখ, আমার নিজেরই ধারণা ছিল না। জঘন্য ভাষায় তাদের বিদায় করা শুরু করলাম। এর ফলে বাজারে কিঞ্চিৎ দুর্নামও হল। বাড়িতে এক বার চোরের উপদ্রবও ঘটল। অগত্যা সিকিউরিটি এজেন্সীতে কথা বলে মাসিক চুক্তিতে দুজন নিরাপত্তারক্ষী রাখা হল।

তাদের কাজ দেখে আমার নিজেরই হিংসা হওয়া শুরু করল। সকালে একজন এবং রাত্রে একজন। দুজনেরই কাজ হল খাটিয়ায় ঘুমানো। মানুষে যে এত ঘুমাতে পারে আমি কোন দিন কল্পনাও করতে পারি নি।

তবু তাদের কিছু বললাম না। এমনিতে ঘুমালেও, এলাকায় যখন চাউর হয়ে যায় এ বাড়িতে নিরাপত্তারক্ষী এসেছে, তখন চোরেদের যাওয়া আসা কমে যায়।

মাসী এর মধ্যে ফোন করলেন। কন্যাপক্ষের বাড়ি যেতে হবে।

আমি এবারেও বারণ করলাম না। আমার মাথা মুন্ডন হয়েছে, পরনে স্যুট প্যান্ট, আমি মেয়েটির বাড়িতে গেলাম।

তারাও যে খুব গরীব ঘরের লোক, এ কথা বলা অন্যায় হবে। তারাও বেশ ধনী। তবে হঠাৎ বড়লোক সেটা বাড়ির রঙের শেড দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এবারে বিয়ের দিন ক্ষণের ব্যাপারে কথা বলা শুরু হতেই আমি বললাম মেয়েটির সঙ্গে একান্তে আরও কিছু কথা আছে।

মেয়েটি আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল।

আগ্রহী গলায় বলল “বলুন”।

আমি বললাম “আপনি আমাকে বিয়েতে আগ্রহী”?

মেয়েটি বলল “হ্যাঁ। আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই”।

আমি খুশি হয়ে বললাম “ধন্যবাদ। প্রত্যাখ্যানের কষ্ট সহ্য করতে হল না”।

মেয়েটি হাসল। বলল “আর কিছু বলবেন?”

আমি আমার ব্যাগ নিয়ে এসেছিলাম, সে ব্যাগের ভিতর থেকে একখানি ফ্ল্যাপি ফাইল বার করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললাম “একটু দেখবেন?”

মেয়েটি ফ্ল্যাপিটা হাতে নিয়ে বলল “কী আছে?”

আমি বললাম “প্লিজ দেখুন”।

মেয়েটি ফাইলটা খুলল। তার ফেসবুক টাইমলাইনে করা ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরা একগাদা ফটো, মাখো মাখো কমেন্ট, সব পেজ আমি প্রিন্ট আউট করে নিয়ে এসেছিলাম। মেয়েটি সে সব দেখে আমার দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে বলল “এগুলো কী?”

আমি উঠে পড়ে বললাম “ফটোপেপারে প্রিন্ট করা, অ্যালবাম করতে পারবেন। ভাল থাকবেন, ধন্যবাদ”।

মেয়েটি চিৎকার জুড়ল “অসভ্য, ইতর, রাসকেল, সাইকো কোথাকার” তার সঙ্গে বিভিন্ন বাছাবাছা বিশেষণ। আমি হাসি মুখে মেয়েটির ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রয়িং রুমে এসে মাসীকে বললাম “আমি এলাম, সব রিপোর্ট মেয়েটার থেকে পেয়ে যাবে”, বাকি সবাইকে হাসিমুখে শুভরাত্রি বলে আমি বেরিয়ে এলাম।

।।ষষ্ঠ দিন।।

পিম্পি আমাকে “গোল্ড ডিগার” শব্দটির মানে শিখিয়েছে।

আমি গুগল করি, বিভিন্ন ভিডিও দেখি। নিরাপত্তারক্ষীদের হাতের ছাতুমাখা খাই।

মাঝে মাঝে অফিস ডুব মারি। একা একা শহর দেখি।

ভালই আছি।

তবে মাসী আমার সঙ্গে চিরকালের মত সম্পর্কচ্ছেদ করেছে।

সোশ্যাল মিডিয়াকে আমি আগে ভাল চোখে দেখতাম না। পরে দেখলাম নিঃসঙ্গ লোকেদের জন্য এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না। আমি এর মধ্যে একদিন মেয়েটির প্রোফাইলে গেলাম। মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে অন্যত্র। আগের সমস্ত ছবি ডিলিট করা হয়েছে। নতুন ছেলেটির সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে প্রি ওয়েডিং ফটোশ্যুটের ছবি দিয়েছে।

আমার ভারি ভাল লাগে ফেসবুক।

নিঃসঙ্গ মানুষদের জন্য, এর থেকে ভাল জিনিস আর কিছু হতে পারে না...

পাহাড়বাড়ির রহস্য

১

বাগডোগরায় পৌঁছেছিলাম বিকেল পাঁচটা নাগাদ।

ইচ্ছে করলে শিলিগুড়িতে থাকাই যেত কিন্তু পাহাড়ের অমোঘ আকর্ষণে বিকেল বিকেলই রওনা দিয়ে দিলাম।

সেবক রেলগেট, তিস্তা বাজারের জ্যাম পেরিয়ে যখন কালিম্পং পৌঁছলাম তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। পাহাড়ের রাতের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা আছে।

হলুম্বায় বুকিং ছিল। পাইন উড কটেজ। হলুম্বাতে এমনিতেই ভুতুড়ে পরিবেশ করেই রাখা হয় যেন। দেরী করলাম না, আগে ডিনার সেরে নিজের রুমে পৌঁছে ব্যাগ ট্যাগ রেখে গরম জলে গা হাত পা মুছে কম্বলের তলায় ঢুকলাম।

শিরশিরে শীত, বাইরের পাইন, ফার গাছগুলো জলে ভিজে আছে।

বৃষ্টি হয়েছে শুনলাম বিকেলে।

অফিসের কাজে নর্থ বেঙ্গলে আমাকে আর অমিতকে পাঠায়। কোম্পানির কাজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। ঘুরতে আমার কোন কালেই আপত্তি নেই, তাই এসব ট্যুরে আসতে আপত্তি করি না। কলিগ অমিত প্রতিবারই আসে আমার সঙ্গে, এবারে অমিতের বাড়িতে একটা সমস্যা হয়ে যাওয়ায় শেষ মুহূর্তে আসতে পারল না।

কালিম্পংকে কেন্দ্র করে নর্থ বেঙ্গলের বেশ কয়েকটা জায়গা যেতে হবে এবারে। সাত দিনের প্রোগ্রাম। মূলত সকালের দিকেই কাজ থাকবে। বিকেলটা ঘুরে নেওয়া যাবে।

ঠিক করেছি বিকেলের দিকটা বাজার ঘুরব। প্রতিটা জায়গার একটা গন্ধ থাকে। সেটাকে প্রাণভরে নিতে না পারলে জায়গাটার প্রতি ভালোবাসা জন্মায় না। থাকাটাও বোরিং হয়ে যায়।

২

পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম। ঘুমিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি। ঘুম থেকে উঠে কোন মতে ব্রেকফাস্ট সেরে ছুটলাম অফিসের কাজে। লাভাতে কাজ ছিল। কাজ সেরে ফিরলাম যখন তখন দুপুর তিনটে। রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম।

দুপুরে ঘুম পায় না।

কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়লাম।

বাজারের দিকে রওনা দিলাম।

কালিম্পং প্রাণবন্ত জায়গা। দার্জিলিংএর ভিড়টা এখানে হয় না। স্থানীয় মানুষজন বেশি। শীতও বেশি না। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকক্ষণ পরে বাজারে পৌছনো গেল।

বাজারের এক পাশে থানা। বা দিকের রাস্তা নিচের বাজারের দিকে নেমে গেছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে পথেই নামতে থাকলাম। বাজারে গিজগিজে ভিড়। স্থানীয় মানুষেরা বাজার করছেন। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের ঢল বেশি। কলেজ ছুটি হয় বোধহয় এই সময়টা।

নামতে নামতে বাস স্ট্যান্ডে চলে এলাম। দেখতেও ভাল লাগে। একগাদা গাড়ি। আর কত সব অজানা জায়গার নাম। সুমোটাইপ গাড়িগুলোতে লোকে উঠে বসেছে। বিভিন্ন জায়গায় গাড়িগুলো রওনা দেবে খানিকক্ষণ পরেই। আমারও একটা গাড়িতে উঠে যেতে ইচ্ছা করল।

নাম না জানা জায়গা যাওয়ার মজাই আলাদা। সমস্যা হল সকালে আবার দার্জিলিং যেতে হবে। ঠিক করলাম সব কাজ শেষ হলে ছুটি দুদিন এক্সটেন্ড করব। কয়েকটা জায়গা ঘুরে নেব। নর্থ বেঙ্গল সুন্দরী। এর টান উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

চায়ের দোকান পেলাম একটা। চা খেতে বসে পড়লাম। গরম লাগছিল অনেকখানি হেঁটে।

বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে খানিকটা চাঙ্গাও করা যাবে।

গাড়ি ড্রাইভার আর যাত্রীদের ব্যস্ততা দেখতে ভালই লাগছিল।

চায়ের স্বাদ ভাল। চুমুক দিয়ে বাড়িতে ফোন করব নাকি ভাবছিলাম, এমন সময় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

পাহাড়ের এই সমস্যা। কখন যে বিনা নোটিশে ঝরতে শুরু করে দেবে কেউ বলতে পারবে না।

স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে অবশ্য তেমন কোন চাপ দেখতে পারলাম না। প্রায় প্রত্যেকের কাছেই রেইন কোট বা ছাতা থাকে। মুহূর্তের মধ্যে সেসব বাইরে চলে এল। জনজীবনে তেমন কোন প্রভাব পড়ল না।

আমি ছাতা নিয়ে আসি নি বলে একটু চিন্তায় পড়ে গেছিলাম বটে, কিন্তু সামনেই একটা ছাতার দোকান দেখে স্বস্তি ফিরে এল।

মন দিয়ে চা খেতে লাগলাম।

"ধরতে পারবেন না"।

আমি বাঙলা শুনে চমকে পাশের দিকে তাকালাম। একজন মাঝারি উচ্চতার মাঝ বয়েসী লোক, গাল ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি, ভিঞ্চিদার মত ডায়লগ দিয়ে দিল। আমি বললাম "আমাকে বলছেন?"

লোকটা বাইরের দিকে তাকিয়ে রুদ্রনীলের মতই বলল "পাহাড়ে যে কখন বৃষ্টি হয় আর কখন মেঘ হয়, ধরতে পারবেন না। আমি দাঁতের ডাক্তার। গত তেরো বছর কালিম্পং এ আছি। আমিই ধরতে পারলাম না, তো আপনি"।

আমি বললাম "ওহ, আচ্ছা। তা ঠিক বলেছেন। আপনার নাম?"

লোকটা বলল "অরণ্যদেব। মাঝে একটা স্পেস আছে অবশ্য। তবে নিজেকে বেশি স্পেস দিই না আর কী। বুঝলেন?"

আমি বুঝলাম অরণ্যবাবু কথা বলার লোক পান না বলে ক্রমাগত ভাট বকে চলেছেন। তবু ভদ্রতার খাতিরে বললাম "বুঝলাম। আচ্ছা, আপনি বাঙালি হয়ে এখানে টিকে আছেন কী করে? গুরুং বাহিনী তাড়া দেয় নি?"

অরণ্য বললেন "এদের নেতার দাঁতও আমি তুলি বুঝলেন? আমাকে তাড়ানোর সাহস এদের নেই। বরং নিজেদের মধ্যে মারপিট করে আমার কাছেই আসে সব। পসার মন্দ হয় নি"।

আমি বললাম "এখানে পসার করতে হল কেন?"

অরণ্য বললেন "আরে সে অনেক গল্প। আমি জাতে বাগদী। ব্রাহ্মণ মেয়ে নিয়ে পালিয়েছিলাম। ধরতে পারলে ছাল ছাড়িয়ে দিত"।

অরণ্য চুপ করে গেলেন।

আমি আগ্রহী হলাম। কিন্তু লোকের ব্যাপারে বেশি জানার ইচ্ছাটাও ঠিক না। ঠিক করলাম নিজে থেকে কিছু বলব না। উনি বলতে চাইলে বলুন।

অরণ্য কাঁচাপাকা দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন “পাহাড়ে থাকতে ভালই লাগে। শুধু ভূমিকম্প হলে জলের বড় কষ্ট। বুঝলেন?”

আমি বললাম “ভূমিকম্প তো রোজ রোজ হচ্ছে না”।

অরণ্য আমার চোখের দিকে ছোট ছোট চোখ করে তাকিয়ে বললেন “হয়, রোজ হয়। বুঝতে পারে না বাকি লোকেরা। গাছ কেটে, পাহাড় ভেঙে রাস্তা হচ্ছে, হোটেল হচ্ছে। অতই সহজ বাওয়া খোদার ওপর খোদকারি করা? অতই? প্রকৃতি রাগে একটু একটু করে কাঁপে ঠিকই। সবাই বুঝতে পারে না। আমি পারি”।

আমার কেন জানি না অরণ্যবাবুকে মানসিকভাবে সুস্থ বলে মনে হল না। চুপ করে গেলাম। অরণ্য ঠান্ডা হয়ে সিগারেট ধরালেন। বললেন “কোথায় উঠেছেন?”

আমি বললাম।

বললেন “ভাল জায়গা। তবে টাকা বেশি। আমি মাঝখানে ভেবেছিলাম হোম স্টে শুরু করব, দিব্যি টু পাইস হবে। পরে পিছিয়ে গেলাম। মানুষ বড় নোংরা। সোফায় নাক খুঁটে রেখে দেবে”।

অরণ্য চোখ মুখ কুচকালেন।

আমি বললাম “তা বটে। তা ছাড়া যিনি নিজের লোকজন ছেড়ে এত বছর বাইরে আছেন, তার আবার সেই ভাষাভাষীর লোকজন ভাল লাগবেই বা কেন?”

অরণ্য আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন “আপনি বুদ্ধিমান। আমার বাড়ি ঘুরে যান। ভাল লাগবে। বেশি দূর না, ডেলোর পথে পড়বে। শহর ছেড়ে খানিকটা গিয়ে যে কাউকে পাহাড়বাড়ি বললে দেখিয়ে দেবে। আপনি আজকে কী করছেন? আজকেই চলুন। ভাল স্কচ খাওয়াব।”

আমি অকস্মাৎ এই আমন্ত্রণে খানিকটা থতমত খেয়ে গেলাম। আবার স্কচের লোভ সংবরণ করাও সম্ভব না। কোনমতে সামলে উঠে বললাম “আজ তেমন কিছু কাজ নেই। যাওয়াই যায়। কিন্তু ফিরব কী করে?”

অরণ্য বললেন “আমার গাড়ি আছে তো। পৌঁছে দেব। চলুন। ওঠা যাক”।

অরণ্য উঠে দাঁড়ালেন। আমার চা খানিকটা বাকি ছিল।

কেন জানি না, লোকটার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করছিল। মনে হচ্ছিল, অনেক গল্প জমে আছে লোকটার মধ্যে। গেলে একেবারে নিরাশ হতে হবে না।

৩

আমি নিশ্চিত অমিত থাকলে অরণ্যবাবুকে ঠিক কাটিয়ে দিত। আমি পারি না। কেউ আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলে তাকে একবারে কাটিয়ে দেওয়া যদি শিখে ফেলতে পারতাম তবে অনেক দিনই অনেক ঝঞ্জাট থেকে বাঁচতাম, কিন্তু আমি পারি না।

মারুতি এইট হান্ড্রেডে বসিয়ে অরণ্যবাবু আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোকের যে পসার ভালই, তা বাড়িটা না দেখলে বোঝা সম্ভব ছিল না। বাড়ির চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া, ঝকঝকে লন, আর বিরাট এক কাঠের বাড়ি। সিনেমায় যেমন দেখায়। গেট খুলতে নিজেই গাড়ি থেকে নেমে গেট খুললেন ভদ্রলোক। গাড়িটা বাড়ির বাউন্ডারির ভেতরে ঢুকিয়ে গেট বন্ধ করলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম “কেউ থাকে না এ বাড়িতে”?

অরণ্যবাবু গম্ভীর মুখে বললেন “ক্রীতদাস পোষা আমার স্বভাবে নেই। আমি আর আমার স্ত্রী সব কাজ নিজেরাই করি। আসুন”।

ভদ্রলোক চাবি দিয়ে তালা খুলে বাড়ির দরজা খুললেন। আমি বললাম “আপনার স্ত্রী নেই?”

অরণ্যবাবু বললেন “আছে তো। ঘরের ভেতরে আছে”।

আমি অবাক হয়ে বললাম “তাহলে আপনি বাইরে থেকে তালা দিয়ে গেছিলেন কেন?”

অরণ্যবাবু উত্তর দিলেন না। আলো জ্বেলে ইশারা করলেন ঘরের ভেতরে গিয়ে বসতে।

অরণ্যবাবুর বাড়ির দেওয়ালে একগাদা মুখোশ। এরকম মুখোশ আমি হলুম্বাতেও দেখেছি। ঘরে কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। কোত্থেকে একটা স্কচের বোতল নিয়ে এসে পেগ বানাতে বানাতে অরণ্য বললেন "বাঙালির মত হারামি জাত আমি দেখিনি মশাই"।

আমার একটু রাগ হল। বললাম "আপনি নিজেও বাঙালি তো"।

অরণ্য গ্লাসটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "নিন, চিয়ার্স বলুন"।

আমি চিয়ার্স বললাম।

অরণ্য বললেন "আত্মসমালোচনা করছি। একমাত্র বাঙালিই সেই জাতি, যে উৎপল দত্তর আগন্তুকের ডায়লগ শেয়ার করে বিজেপিকে ভোট দিয়ে আসে"।

আমি ভ্রু কুঁচকে বললাম "আগন্তুকের সঙ্গে বিজেপির রিলেশন কী?"

অরণ্য বললেন "ইন্টেলেকচুয়াল বোঝানো নিজেকে। এই এক জাত, ফেসবুকে একরকম, ইভি এমে আরেকরকম"।

আমি বললাম "সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তো গোটা দেশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। আপনার এই পাহাড়ে লোক দিয়েছে সব থেকে বেশি। এদের সঙ্গে বাঙালির পার্থক্য কোথায়?"

অরণ্য স্কচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন "ভন্ডামিতে। বাঙালি ভন্ড। মুখে ইন্টেলেকচুয়ালের ভড়ং দেখিয়ে এরা এখনও পণপ্রথা মানে, জাতপাত মানে। বাঙালি পরশ্রীকাতরও বটে। পরের ভাল সহ্য করতে পারে না। এর কারণ হল বাঙালিকে পরিশ্রম করতে হয় নি। সব হাতের কাছে পেয়ে গেছে। মিষ্টি জল, উর্বর শস্যক্ষেত্র। স্ট্রাগল যেটুকু করতে হয়েছিল দেশভাগের সময়। বেসিক্যালি রাজনৈতিক এবং কালচারালভাবে এই সময়ে দাঁড়িয়ে বাঙালির থেকে ভয়েড জাত খুব কম আছে"।

আমার কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছিল না, নেহাত স্কচের দামটা জানি বলে চুপ করে শোনার ভান করলাম।

কথা ঘোরাতে চেষ্টা করলাম "পাহাড়ের লোকেরা আলাদা রাজ্য চাইছে, এ সম্পর্কে আপনার কী মত?"

অরণ্য মুখ বাঁকালেন, "বাদ দিন। ওদিকের জানলাটা খুলুন। ভিউটা নিন। ভাল লাগবে"।

আমি উঠে জানলা খুললাম। চমৎকার দৃশ্য। রাত হয়েছে। কালিম্পং শহরটা আলোয় ঝকঝক করছে।

বললাম "আপনার বাড়ির লোকেশনটা খুব ভাল"।

অরণ্য বললেন "প্রথমে এই বাড়িতে থাকতাম না। পালিয়ে যখন এসেছিলাম, কষ্টে থাকতে হত। পসারও সেরকম নেই। তবে কেন জানি না, আমাদের চলে যেত ঠিক। আমার বউয়ের বাড়ির লোক খুব ডেঞ্জারাস। খুঁজে পেলে বাঁচিয়ে রাখত না। ভয়ও পেতাম সেই সময়টা"।

অরণ্য দুলে দুলে হাসলেন। বললেন "চিপস খাবেন?"

আমি বললাম "হ্যাঁ, খাওয়া যেতে পারে"।

অরণ্য উঠে একটা চিপসের প্যাকেট নিয়ে এলেন।

আমি বললাম "আপনার স্ত্রী..."

অরণ্য চিপসের প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "খেলা ঘুরল হঠাৎ করেই। ঘিসিং সেবার বিরাট ঝামেলা করছে। রাস্তা ফাস্তা আটকে ভয়াবহ অবস্থা। আমি বাজারের পাশে একটা ছোট বাড়িতে ভাড়া থাকি তখন। হঠাৎ দেখি এক লোক রাস্তায় পড়ে আছে রক্তাক্ত অবস্থায়। তাকে তুলে নিয়ে এলাম। আমি

আর আমার বউ সেবা শুশ্রুসা করলাম। সুস্থ করার পর জানা গেল সে এলাকার বেশ ক্ষমতাশালী নেতা রাম চুগাই। তারপর আর আমাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি"।

রাতের দিকে ঠান্ডা পড়ে। স্কচের নেশাটা মজাচ্ছিল। আমি বললাম "পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি মানে?"

অরণ্য হেসে বললেন "স্কচটা ভাল?"

আমি বললাম "খুব"।

অরণ্য বললেন "দামী স্কচ। বেশ দামী। প্রতি রাতে একজন কমিউনিস্ট নেতা খেতেন নাকি নিয়ম করে। জীবন দৈর্ঘ্য বাড়ে, হৃদযন্ত্র ভাল থাকে। গৌরকিশোর ঘোষের নাম শুনেছেন?"

আমি মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ সাংবাদিক ছিলেন"।

অরণ্য বললেন "গৌরকিশোর ঘোষ একজন ডানপন্থী সাংবাদিক ছিলেন। ওর লেখাতে মজার ছলেতেই বলেছিলেন, ক্যাপিটালিস্ট মানে নিজের টাকায় যে গাড়ি চড়ে। আর কমিউনিস্ট মানে পাবলিকের টাকায় যে গাড়ি চড়ে"।

আমি বললাম "হবে হয়ত। আমি কমিউনিস্ট নই, বিজেপি, তৃনমূল কিছুই নই। আমার সঙ্গে অন্য গল্প করলে ভাল হয়"।

অরণ্য হাসলেন "আমি কমিউনিস্ট ছিলাম। নেতার পা চেটে চাকরি চাওয়ার মত ধান্দাবাজ কমিউনিস্ট না, আদর্শবাদী কমিউনিস্ট। যুক্তিবাদে বিশ্বাস করতাম, ঈশ্বর মানতাম না, প্রেতাত্মা ইত্যাদির তো প্রশ্নই আসে না"।

আমি অবাক হয়ে বললাম "তো এখন আপনি কি এসবে বিশ্বাস করেন? মানে ঈশ্বর কিংবা প্রেতাত্মা?"

অরণ্য আমার দিকে তাকিয়ে স্কচের গ্লাস এক চুমুকে শেষ করে দিলেন। বোতল থেকে স্কচ ঢেলে আবার গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন "পসার যখন জমে না, তখন জমে না। কিন্তু একবার জমতে শুরু করলে তখন আর আপনাকে পায় কে। এ এলাকার শুধু নয়, কোন জাদুমন্ত্রবলে দূর দূরান্ত থেকে আমার কাছে রুগী আসতে শুরু করল। আপনি কখনও দাঁত তুলিয়েছেন?"

আমি বললাম "হ্যাঁ, একবার, মানে আক্কেল দাঁতটা..."

অরণ্য বললেন "বুঝতে পারছেন আশা করি একজন দাঁতের ডাক্তারকে পেশেন্ট প্রতি কত সময় দিতে হয়"।

আমি বললাম "হ্যাঁ, তা বটে"।

অরণ্য বললেন "প্রথম দিকে নার্ভাস ছিলাম, পরের দিকে সাবলীল হলাম। সবটাই প্র্যাকটিস। মানুষজন বিশ্বাস করতে শুরু করল। তখন এদিকে এত দাম ছিল না জমির। জমি কিনে বাড়ি করা হল। এবং একদিন বাড়ি ফিরে দেখলাম বউ নেই। পাগলের মত এদিক সেদিক গিয়ে অবশেষে জানতে পারলাম আমি ছাড়া সবাই জানে, আমার অবর্তমানে লেপচা নেতা রাম চুগাই, আমার বউয়ের বিছানা গরম করত এবং শেষমেশ তাকে নিয়ে ভেগেছে"।

আমি চমকে উঠলাম।

অরণ্য নির্লিপ্তভাবে কথাগুলো বলে আবার একচুমুকে হাতের গ্লাসের স্কচ শেষ করলেন।

অরণ্য বললেন "আপনার গ্লাস খালি যাচ্ছে। নিন"।

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম "না না, থাক। আপনি খান"।

অরণ্য হেসে বললেন "ভয় পাবেন না। চিন্তাও করবেন না। শুনে যান না। মন্দ লাগবে না শুনতে। যাই হোক, যেটা বলছিলাম। আমার বউ নিয়ে ভাগবে আর আমি চুপ করে থাকব? বেশ কিছুদিন গুমরে থাকতাম। চেম্বারে যেতাম না। কিছুই খেতাম না। শুধু মনে পড়ে যেত, এই মেয়েটা আমাকে কত

ভালবাসত। কীভাবে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল। সে এক অসহায় হাহাকার, মনে হত আমি মরে যাব। একা একা ডিপ্রেশনে গিয়ে মদের মধ্যে ডুবে ছিলাম, এমন সময় খবর এল রাম চুগাই আমার বউকে নিয়ে লোলেগাওয়ের দিকে আছে। কোন দিকে তাকালাম না। একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি কিনেছিলাম, সোজা চলে গেলাম লোলেগাওয়ের দিকে। এদিক সেদিক খোঁজ নিয়ে একটা গ্রামে গিয়ে দেখি আমার বউ পরম যত্নে চুগাইয়ের কাপড় মেলছে বাড়ির বাইরের দড়িতে। সেই বউ, যার জন্য সব ছেড়ে আমি চলে এসেছিলাম। সে বাড়ি চুগাইয়ের আদি বাড়ি। ঠিক করে গেছিলাম সে মেয়েছেলেকে খুন করে ফিরব, পারলাম না। ফেরার পথ ধরলাম। পরের দিন থেকে আবার চেম্বারে যাওয়া শুরু করলাম। যথারীতি রুগী আসাও শুরু হল। মাথা থেকে বউয়ের সমস্ত স্মৃতি মুছতে আমার ঠিক তিরিশ সেকেন্ড লেগেছিল"।

অরণ্য চুপ করলেন।

ঘরে এক অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় আমি নড়ে চড়ে বসে বললাম "আপনি যে বলেছিলেন, আপনার স্ত্রী ঘরের ভিতরে আছে?"

অরণ্য ধীর গলায় বললেন "বছর তিনেক আগে এক সন্ধ্যেবেলা হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। আমি বাড়ি ফিরে এসেছি প্র্যাকটিস থেকে রাত দশটা নাগাদ। তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখি আপনি যেখানটা বসেছেন, ঠিক সেখানে চুপ করে বসে আছে। চোখে আর্তি, যেন ক্ষমা চাইছে। আমি চেঁচিয়ে উঠে ওকে ছুঁতে যেতেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার অবস্থা বুঝুন, এমনিতেই বাড়িতে একা থাকতাম, তার ওপর এরকম দৃশ্য। আমার কাছে তো তখনও কোন খবর আসে নি সে মারা গেছে। কিন্তু সে জিনিস দেখার পরে আর কি মাথা ঠিক রাখা যায়? কোন রকমে সে রাতটা এক লোকাল লেপচার বাড়িতে কাটালাম, সকালে খবর এসে গেল। ততক্ষণে আমি বুঝে গেছিলাম অবশ্য। মনে মনে তাকে ক্ষমা তো সেদিনই করে দিয়েছিলাম। তবু সে সমস্যা গেল না। যখনই এ বাড়িতে ঢুকতাম, কোথাও না কোথাও বসে থাকতে দেখতাম। চোখে মুখে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গি। ঘুম শিকেয় উঠল, আলসার ধরা পড়ল, পসার গেল চলে। তাকে না দেখলেও দেখতে পাওয়া শুরু করলাম।"

স্কচের নেশা সত্ত্বেও আমার গা শিরশির করতে লাগল। আমি চারদিকে তাকালাম। আধো অন্ধকারে সবকিছু দেখেই ভয় লাগতে লাগল।

অরণ্য বললেন "একটা মজার ব্যাপার কী হল জানেন? সেটা সত্যিই মজার। আমি একদিন লনের মধ্যে রোদে চুপ করে বসে আছি, রাতে ঘুমাই নি, চোখের তলায় কালি, এমন সময় দেখি রাম চুগাই এসে বাড়ির সামনে ঘুর ঘুর করছে। অনেক চিন্তা ভাবনা করে সে ব্যাটা গেট খুলেই আমার পায়ে ধরে কান্নাকাটি জুড়ল। আমার অবস্থা বর্ণনাতীত, যে লোক আমার বউ নিয়ে পালিয়েছে, সে আমার পা ধরে কান্নাকাটি করছে, এরকম অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স কে কল্পনা করতে পারে! ভাববেই বা কেউ কী করে? যাই হোক, অনেক কষ্টে সে ব্যাটাকে শান্ত করে যা জানা গেল আমার বউকে সে বড় জ্বালাতন করত। বউ পালাতে চেষ্টা করেছিল ওর ওখান থেকে, কিন্তু পারে নি। শেষ মেশ এক প্রকার না খেয়েই মারা যায়। কিন্তু মারা যাবার পরে চুগাইকে নিয়মিত আমার বউ দেখা দেওয়া শুরু করেছে। চুগাইয়ের জিনা হারাম হয়ে গেছে"।

অরণ্য অপ্রকৃতিস্থের মত জোরে জোরে হেসে উঠলেন।

আমি চোখ বন্ধ করে রইলাম। মনে হচ্ছিল, চোখ বন্ধ হলেই অরণ্যদেবের বউ আমার চোখের সামনে প্রতীয়মান হবেন।

অরণ্য বোতল থেকে সরাসরি নিজের গলায় মদ ঢেলে বললেন "বাঙালি ঈশ্বর অবিশ্বাসী যুক্তিবাদী কমিউনিস্টের বাচ্চা, আমি, এসব শুনে হাসব না কাঁদব কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাম চুগাইকে বিদায় করে ঠিক করলাম কালিম্পং এর বাসা এবার ছাড়তে হবে। শেষ জীবনটা অন্য কোন খানে কাটিয়ে দি। সমতলে আর পারব না, শরীর নেবে না। মংপু গুরুদেবের জায়গা, ওখানেই একটা বাড়ি দেখাশুনা করতে যাব ঠিক করেছি এমন সময় বেরোতে গিয়ে দেখি বাড়ির দরজায় এক তিব্বতি সন্ন্যাসী চুপ করে বসে আছে। জিজ্ঞেস করলাম কী চাই? আমাকে একগাদা মুখোশ ধরিয়ে দিয়ে উঠে বেরিয়ে গেলেন। আমি হাঁ করে মুখোশগুলোর দিকে তাকালাম। কিছুই বুঝলাম না। তবে সিক্সথ সেন্স কিছু একটা বলছিল। ঘরে এসে পেরেক মেরে মেরে মুখোশগুলো টাঙিয়ে দিলাম। মংপু যাওয়াও ক্যান্সেল করলাম। অবাক ব্যাপার হল, সেদিনের পর থেকে যেখানে সেখানে ওকে আর দেখতে পাই নি"।

কথাগুলো বলে অরণ্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন "চলুন, আপনাকে দিয়ে আসি। মদে মদে নইলে বারোটা বেজে যাবে"।

আমি উঠলাম। মুখোশগুলোর দিকে না চাইতেই চোখ চলে গেল। অজানা ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম হঠাৎই। কোট পরতে পরতে অরণ্য বললেন "ওহ, আরেকটা কথা বলা হয় নি, যেদিন রাম এ বাড়ি এসেছিল, তার পরের দিন রাম চুগাইয়ের বডি রহস্যজনকভাবে খাদের জঙ্গলে খুঁজে পাওয়া যায়। চোখে মুখে আতঙ্কের স্পষ্ট ছাপ। কেউ কিছুই বুঝতে পারে নি। ওর মৃত্যু রহস্য অমীমাংসীতই থেকে গেল। আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বের করি"।

অরণ্য পা চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি এই আধো অন্ধকার ঘরে মুখোশগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

কিছু একটা অস্বস্তি হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম কিন্তু ঠিক কী হচ্ছে ধরতে পারলাম না। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে অরণ্য আমাকে গাড়িতে বসিয়ে বাড়িতে তালা দিলেন।

গাড়িতে উঠে বললেন "মদ খেয়েছি বলে ভাববেন না, মদ খেলে আমার ড্রাইভিং এর হাত ভাল হয়ে যায়"।

আমি সামান্য ভয় পেলেও প্রত্যুত্তরে হাসলাম। এই ভুতুড়ে বাড়িতে কে থাকতে যাবে রাতে? তার থেকে কোন মোদো মাতাল যেদিকেই নিয়ে যাক, যাওয়া যাবে।

বাস্তবিকই দেখা গেল অরণ্যদেব মত্ত অবস্থাতেই ভাল গাড়ি চালান। আধঘন্টার মধ্যে হলুম্বার গেটের সামনে পৌঁছে গেলাম আমরা।

গাড়ি থেকে নামতে যাব, অরণ্য বললেন "কাল আমি মাঙ্গান যাচ্ছি, পরশু ফিরব। আপনি থাকলে দেখা হবে"।

আমি হাসার চেষ্টা করলাম, বললাম "নিশ্চয়ই"।

ভেতরে ভেতরে বললাম পাগল কুকুরে কামড়েছে আমায় যে আপনার বাড়ি যাব?

হোটেলের ভেতরের জঙ্গুলে রাস্তায় হাঁটা শুরু করেছি এমন সময় অরণ্য গাড়ির হর্ন বাজালেন। আমি অবাক হয়ে ফিরে এসে বললাম "কিছু বলবেন?"

অরণ্য হাসলেন "আপনাকে কিছুক্ষণ মুখোশগুলোর সাথে ছেড়েছিলাম। কিছু পার্থক্য বুঝেছিলেন?"

আমি বললাম "না তো, কী পার্থক্য?"

অরণ্য বললেন "আপনি যখন আমার বাড়ি ঢুকেছিলেন, মুখোশগুলোর চোখ বন্ধ ছিল। বেরনোর সময় চোখগুলো খোলা ছিল। রাতে ও জেগে ওঠে। সন্ন্যাসী আত্মাবন্ধন করেছিলেন আসলে। আপনি লক্ষ্য করেন নি, বেঁচে গেছেন। ওখানে থেকে লক্ষ্য করলে ভয় পেয়ে যেতেন। সকালে সবক'টা মুখোশের চোখ বন্ধ হয়ে

যায়। প্রথম যেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম, এ মহিলা আমাকে ছাড়বে না। যেখানেই যাব, তার অপরাধবোধ নিয়ে ক্ষমা করে দাও মুখ নিয়ে পেছন পেছন যাবে। তার থেকে যা কারুকাজ করার মুখোশের ভেতর থেকেই করুক। চোখের ওপর দিয়ে যাবে অন্তত। টিকে গেলাম তার পর থেকে। কাল সকালে এলে দেখতে পাবেন মুখোশগুলোর চোখগুলো সব বন্ধ। কোথাও গেলে ওকে আর ফেলে রেখেও যাই না। সঙ্গে করেই নিয়ে যাই। কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে ওর ওপর। ছাড়তে পারি না। মনে হয় থাকুক বাকি জীবনটা। কী আর হবে বলুন?”

অরণ্য ম্লান হাসলেন। তারপর আর কোন কথা না বলে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে গেলেন। আমার প্রবল শীত করছিল। কী কুক্ষণে যে এর বাড়ি গেছিলাম কে জানে! মুখোশগুলো সত্যিই চোখ খুলে তাকায়! কী সাংঘাতিক! এও হয় নাকি?

চড়াই ভাঙতে শুরু করলাম। ডিনার টাইম হয়ে গেছে হলুম্বায়।

ডিনার রুমে পৌঁছে খেয়াল হল সর্বত্র সেই তিব্বতি মুখোশগুলো। চোখ খুলে হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে…

যাবার বেলায়

মেট্রোতে অফিস টাইমের ভিড়টা আজকে অদ্ভুতভাবে কম। উজ্জ্বল রোদ, সোমবার। কোন রকম মিটিং, মিছিল, বনধ কিছুই নেই। তবু মেট্রোতে অফিস টাইমের সেই মারকাটারি ভিড়টা নেই।

উপমন্যু বসার জায়গাও পেল। এক ভদ্রলোক সরে গিয়ে জায়গা করে দিলেন। এই সময়ে টালিগঞ্জ থেকে বসার জায়গা পাওয়া মিরাকেল। উপমন্যু চারদিকে তাকাল।

সবাই মোবাইলে ব্যস্ত। একটা গোটা জাতি মাথা নিচু করে রয়েছে।

তাকেও ফোন দেখতে হত না এমন নয়।

যতক্ষণ অটোতে ছিল ফোন বেজে গেছে। উপমন্যু ফোন তোলে নি। নিজের নিয়মে ফোন বেজে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

তারপরে আবার অবুঝ শিশুর মত বাজতে শুরু করেছে। উপমন্যুর পাশে বসা ভদ্রলোক তাকে সতর্কও করেছেন, "ফোন বাজছে তো"।

উপমন্যু প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে হেসেছে।

ভদ্রলোক সম্ভবত তাকে পাগল ভেবেছেন। মেট্রোর টিকিটের লাইনেও ফোনটা বেজেছিল।

উপমন্যু পাত্তা দেয় নি।

পাত্তা দেওয়ার মত কিছু হয় নি।

ট্রেন পাতালে প্রবেশের পর ফোন বিরক্ত করা বন্ধ করল তাকে। উপমন্যু খুশি হল।

আশে পাশের লোকজন কেউ গেম খেলছে, কেউ একা একাই মোবাইলের দিকে তাকিয়ে হেসে যাচ্ছে।

উপমন্যুর মাথায় এল, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ জন্মালে গেম খেলতেন? এই যে একটা লোক বন্দুক নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে, সবাইকে গুলিতে ঝাঁঝরা করছে, না করতে পারলে নিজে মরছে... এই তীব্র অস্তিত্বরক্ষার যুগে রবীন্দ্রনাথ জন্মালে এত লিখতেন? নাকি গেম খেলে আর হোয়াটস অ্যাপ, ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম করেই সময় কাটিয়ে দিতেন?

উত্তর ভেবে ওঠার আগে ফোনটা আবার বেজে উঠল।

উপমন্যু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। প্রযুক্তি পাতালেও প্রবেশ করে ফেলেছে।

পালানোর পথ নেই।

আশে পাশের লোক তার দিকে তাকাচ্ছে। একজনের ফোন বাজছে, অথচ সে ধরবে না, এ কী ব্যাপার?

উপমন্যু গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

সামনের মহিলার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

তার দিকে তাকিয়ে বললেন "ফোনটা ধরুন"।

উপমন্যু প্রত্যুত্তরে আবার হাসল।

মহিলাটি বললেন "টেলি মার্কেটিং কল বুঝি? তাহলে না ধরাই ভাল। বড় জ্বালায়"।

ভদ্রমহিলার এই ব্যাখ্যার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আশে পাশের মানুষেরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তার দিকে আর কেউ তাকাল না। সবাই ধরে নিল ফোন করে কোন ক্রেডিট কার্ডের এজেন্ট বা লোনদানকারী জ্বালাতন করছে বলেই উপমন্যু ফোনটা ধরছে না।

শান্তি বর্ষিত হল। ফোনটা যদিও সে চুক্তি মানল না। বেজে চলল।

কালীঘাট থেকে এক ঝাঁক যুবতী উঠল। তার সামনে দাঁড়াল। উপমন্যু সুপুরুষ।

তার দিকে দুজনের চোখ পড়ল। আগ্রহ সহকারে তাকাল।

এ ওকে ঠেলছে।

উপমন্যুও তাকাল। দুজনের দিকেই।

এই মুহূর্তগুলো কলেজ লাইফে হৃদযন্ত্রের ক্লাস নিত। নন কো এড ছেলেদের জন্য এই সময়গুলো অ্যাসিড টেস্ট। আগে হলে উপমন্যু মাথা নামিয়ে ফেলত।

আজ নামাল না। হাসি হাসি মুখে মেয়েদুটির দিকে একবার তাকিয়ে মাথা উঁচু করে বসে রইল।

যতীন দাস পার্ক থেকে আরও এত লোক উঠল মেয়েদুটিকে আর দেখা গেল না। উপমন্যুর ফোন অবশ্য রণে ভঙ্গ দিল না।

বাজতে লাগল।

অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে খেয়াল হল, এই সময় "আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে" গানটা মাথায় বাজতে শুরু করেছে।

এই গানটা কেন? এখন বসন্ত নয়, পূর্ণিমাও নয়। এক্কেবারে কেজো দিন, তবে? "যাব না এ মাতাল সমীরণে" মাথায় ঘুরবে কেন?

উপমন্যু বেশি ভাবল না আর। গুনগুন করতে শুরু করল। নেতাজী ভবনে কয়েকজন নামলেও ফাঁকা হল না।

মেট্রো নড়ে উঠতে উপমন্যু উঠে দাঁড়াল। সামনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক জন্টি রোডসের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ফেলে যাওয়া জায়গাটা দখল করল।

উপমন্যুর হাসি পেল। একটা স্টেশনের জন্যও বসতে পারলে মানুষ বর্তে যায়। জায়গা ছাড়া যাবে না।

বড় কষ্ট পরাজয়ের।

ভিড়টা এগোতে বাধা দিচ্ছিল।

উপমন্যু কোন মতে ঠেলে গেটের দিকে এগোল। মেট্রো স্টেশনে ঢুকছে।

"আমার এ ঘর বহু যতন করে, ধুতে হবে, মুছতে হবে মোরে"... দরজা খুলতে একদল প্ল্যাটফর্মে ঝাঁপাল, আরেকদল মেট্রোতে।

যোগ বিয়োগের জটিল সমীকরণের মধ্যেই উপমন্যু নামতে পারল। ফোনটা আবার বাজছে।

অবশ্য এখন কারও উপমন্যুর ফোনে মন দেওয়ার সময় নেই। সবাই দৌড়তে শুরু করেছে। পাতাল থেকে বেরোনোর লড়াই। ভীষণ তাড়া সবার।

উপমন্যু ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙল। প্রবল তাড়ায় একজন তার পা মাড়িয়ে গেল, উপমন্যু কিছু বলল না। টোকেন জমা দিয়ে রেলিং ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আবার সিঁড়িতে ওঠা।

এবারও উপমন্যু তাড়াহুড়ো করল না।

শহরটা তার গায়ে আছড়ে পড়ল দিনের আলো গায়ে পড়তেই। উপমন্যু হাঁটতে শুরু করল।

স্কুল, কলেজ, অফিস, ব্যবসা... সর্বত্র প্রবল গতিতে ছুটে চলেছে মানুষ।

খানিকটা হাঁটার পর উপমন্যু একটা রিক্সা নিল। উঠে বসে গন্তব্য বলতেই বিহারী রিক্সাওয়ালা তাকে তুলে দৌড়তে শুরু করলেন।

ফোন বাজছে। আবার। উপমন্যু ফোনটা বের করে নম্বরটার দিকে তাকাল। ফোনটা কেটে দিল। কলেজ জীবনের কথা ভাবতে চেষ্টা করল। রবীন্দ্রসদনে নেমে তারা নন্দনে সিনেমা দেখতে যেত। সিনেমাটা বড় কথা না, হুল্লোড়টাই ছিল আসল।

শ্রুতবর্মা সব থেকে বেশি লাফাত। ও এখন বোস্টনে থাকে। আসে না বললেই চলে। ঋতায়ণ বেঙ্গালুরুতে। পিনাকী সিঙ্গাপুরে থাকে।

পিনাকী নন্দনে এসে মেয়ে দেখলে বিভিন্নভাবে লড়াই চালিয়ে যেত। কিছু করতে পারত না। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ হয়েছে শেষ পর্যন্ত। উপমন্যু যেতে পারে নি অফিসের কাজের জন্য।

খুব রাগারাগি করেছিল পিনাকি।

নন্দনের কাছের বাস রাস্তাতেই তো একবার শ্রুতবর্মাকে অত্যধিক গালাগালি দেওয়ার জন্য বাস থেকে তাদের গোটা দলটাকে নামিয়ে দিয়েছিল বাস কন্ডাকটার। একটুও দুঃখ পায় নি তারা। যেন বিরাট কোন কাজ করেছিল, এই আনন্দে হই হই করেছিল খুব।

ভিক্টোরিয়ায় একবার এক যুগলকে চুমু খেতে দেখতে ঝোপে ঢুকতে গিয়ে তাড়া খেয়েছিল ঋতায়ণ। ভাবতেই হেসে ফেলল উপমন্যু।

এসব স্মৃতি কোন দিন পুরনো হবে না।

নার্সিং হোম এসে গেছে। উপমন্যু রিক্সাভাড়া দিয়ে নামল। গিজগিজ করছে লোক। উপমন্যু রিসেপশনে গিয়ে বলল "অরুন্ধতী মিত্র, এখন দেখতে যেতে পারি?"

রিসেপশনিস্ট তার দিকে বিরক্ত চোখে তাকালেন "সকাল থেকে আপনাকে ফোন করে যাচ্ছি ধরছেন না কেন?" পরক্ষণেই চোখ মুখ নরম হয়ে এল তার, "শি ইজ নো মোর"।

উপমন্যু যেন এর স্পয়লার আগেই পেয়ে গেছিল এমনভাবে ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল "আচ্ছা। দেখতে পারি এখন?"

রিসেপশনিস্ট একজনকে ডেকে দিলেন। তাকে নিয়ে চললেন সে মেয়েটি। অসংখ্য লোক নার্সিং হোমে। কেউ টাকা গুণতে ব্যস্ত, কেউ বা কেঁদে চলেছেন। কেউ বা রিপোর্ট নিয়ে বসে রয়েছেন শক্ত মুখে। ডাক আসবে যে কোন সময়। এত কিছুর মধ্যেও বেশিরভাগ মানুষ ফোনেই ঢুকে আছেন। উপমন্যু সব পিছনে ফেলে হাঁটতে লাগল।

মাথায় গানটা ফিরে এসেছে আবার "আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে"...

সাদা চাদরে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে অরু।

উপমন্যু চাদর সরাল।

অরুর মুখে একটুও হাসি নেই। নাকি আছে? উপমন্যু তীক্ষ্ণ চোখে অরুর দিকে তাকাল। যাওয়ার সময়ে একটুও হাসে নি?

তাকে সঙ্গে করে যে মেয়েটি নিয়ে এসেছেন, উপমন্যুর এভাবে তাকিয়ে দেখা দেখে খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েই হয়ত বলল "আপনি ওনার কে হন? স্বামী?"

উপমন্যু ঘাড় নাড়ল।

মেয়েটি বলল "আচ্ছা, বডি হ্যান্ডওভার নেবার আগে ডিউজগুলো ক্লিয়ার করে দেবেন। আপনি কীসে পেমেন্ট করবেন? কার্ডে, না ক্যাশে?"

উপমন্যু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল "পেমেন্ট না করলে কী হতে পারে?"

মেয়েটি অবাক হল। এ কী অদ্ভুত প্রশ্ন? সে চলে গেল। মিনিট দুয়েক উপমন্যু অরুর দিকে তাকিয়ে থাকল, মেয়েটি দু জন পুরুষকে নিয়ে এসেছে। একজন তাকে বলল "আপনি ডিউজ ক্লিয়ার করবেন না বলেছেন?"

উপমন্যু বলল "না। তা বলিনি। আমি শুধু ওর কাছে জানতে চেয়েছি পেমেন্ট না করলে কী হতে পারে"।

ওরা পরস্পরের দিকে বিভ্রান্তভাবে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

একজন বলল "ডিউজ ক্লিয়ার না করলে বডি আটকে থাকবে"।

উপমন্যু বলল "ঠিক আছে। কত টাকা হয়েছে?"
"আপনি রিসেপশনে আসুন। আপনাকে বিল দেওয়া হবে"।
উপমন্যু অরুন্ধতীর মুখে চাদরটা যেমন ছিল, তেমন করে ঢেকে দিল।
লোকগুলোর পিছন পিছন আবার রিসেপশনে গিয়ে বসল।
তিন লক্ষ পচাত্তর হাজার টাকার একটা বিল দিয়েছে।
উপমন্যু বিলটা নিয়ে খানিকক্ষণ নেড়ে চেড়ে দেখে বলল "আমি টাকা নিয়ে আসছি"।
ওরা নিশ্চিন্ত হল।
নার্সিং হোমের বাইরে থেকে উপমন্যু আবার রিক্সা নিল।
ফোন আবার বাজতে শুরু করেছে। অরুন্ধতীর বাড়ির লোক? হবে হয়ত। উপমন্যু ফোন বের করার প্রয়োজনীয়তা পেল না।
গানটা মারাত্মকভাবে জেকে বসেছে মাথায়। গলাটা অরুন্ধতীর। ও এই গানটাই সব থেকে ভাল গাইত।
মেট্রো স্টেশনে কী ভিড়! টিকিটের লাইনে শুনতে হল "ও দাদা, ফোনটা ধরুন"।
উপমন্যু এবারেও হাসল।
সিঁড়ি ভেঙে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছল। কবি নজরুল দু মিনিটের মধ্যে আসবে।
উপমন্যু একটা বেঞ্চে বসল।
বিলটা না দিলে কী হবে? অরুন্ধতীকে পোড়ানো হবে না? অতৃপ্ত আত্মা হয়ে ঘুরবে অরু?
যেদিন জানা গেছিল টিউমরটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে ভয়ংকর গতিতে অরু তাকে বলেছিল "বিয়ে করবে বুঝলে? সারাজীবন একা থাকবে না। কোন দরকার নেই"।
উপমন্যু হেসেছিল। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল "কিচ্ছু হয় নি। সেরে যাবে। কয়েকটা তো কেমো। বেশিদিন লাগবে না"।
অরু বলেছিল "নাহ। আমি জানি, এ সারবে না"।
উপমন্যু আর বেশি স্তোক দেয় নি। জেগে বসেছিল।
অরু সেদিনই মরে গেছিল আসলে। কেমোগুলো তো মৃত্যুর ইনস্টলমেন্ট ছিল।
মেট্রো আসার শব্দ বাড়ছে। উপমন্যু উঠে দাঁড়াল। শরীর ঝুঁকছে।
ঝাঁপ দিতে হবে। কেউ কিছু বোঝার আগেই শেষ করে দিতে হবে নিজেকে।
ট্রেন এগিয়ে আসছে। উপমন্যুর শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। মাথায় গানটা যায় নি এখনও। "যাব না, এ মাতাল সমীরণে"...
লাফটা দেওয়ার সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ সময়ের আগে উপমন্যু মিত্র থমকে দাঁড়াল। মেট্রো প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করল নির্বিঘ্নে।
ট্রেনের দরজা খুলে গেল। বাকি সবার মত উপমন্যু মেট্রোয় প্রবেশ করল।
ফোনটা আবার বাজতে শুরু করেছে।
নার্সিং হোম থেকে।
উপমন্যু ধরে বলল "শুনুন না, বডিটা মেডিকাল কলেজে দান করে দেবেন না হয়? টাকা দিয়ে একটা মৃত দেহ ছাড়িয়ে আনার কোন যুক্তি আছে কী, তার চেয়ে যদি চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন উন্নতি হয় বডিটা নিয়ে..."
আশে পাশের সবাই তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে।
ফোনটা কেটে উপমন্যু গেমটা খেলতে শুরু করল।
একটা মানুষ বন্দুক নিয়ে সবাইকে মারতে নামছে একটা উপত্যকায়। হয় সে আত্মরক্ষা করে সবাইকে মেরে ফেলবে। নয়ত তাকে অন্য কেউ মারবে।

বাঁচতেই হবে।
মরলে গেম ওভার...